

- ♦ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে বাসদের মতামত : পৃষ্ঠা ৪
- ♦ মে দিবস : এক প্রেরণার নাম : পৃষ্ঠা ৫
- ♦ ভারতের পানি আশ্রাসন তিস্তা নদীর পানি সংকট : পৃষ্ঠা ১৬

- ♦ শ্রীলঙ্কায় বামপন্থি সরকারের নতুন বাজেট কেমন হলো? : পৃষ্ঠা ১৬
- ♦ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা কনভেনশন ২০২৫ : পৃষ্ঠা ১৬
- ♦ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ : পৃষ্ঠা ১৬

দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার স্বপ্নে বিভোর অন্তর্বর্তী সরকার হাত বদল নয়, ব্যবস্থা বদল চাই

৫ আগস্টের গণ অভ্যুত্থান সমাজের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। কিন্তু জুড়ে বসা সরকার পুরনো গাছের শিকড়ে জল ঢেলে উপরে ডালপালা কাটছাঁট করে চলেছে। ফলে, পুষ্প-ফলে, পত্রে নতুনত্ব কিছু আসছে না। গত ৫৪ বছর ধরে বারে বারে হাত বদল হচ্ছে, চেহারা বদল হচ্ছে কিন্তু মূলে আমূল পরিবর্তন মানুষ দেখছে না। কারণ শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বদলের পরিবর্তে একই ব্যবস্থার নতুন বন্দোবস্তের নামে ঘষামাজা, কথিত নতুন রং করা, মেরামতি কাজ সারা ইত্যাদিতে মানুষের মনযোগ আকর্ষণ করে বাহবা কুড়ানোর চেষ্টা ক্ষুধিত বঞ্চিত মানুষের পেটের জ্বালা, মনের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। অন্যদিকে নতুন লুটেরা গোষ্ঠীর হাতে আলাদিনের চেরাগ এসে গেছে। এবারও বৈষম্য বিরোধী গণ অভ্যুত্থানে অসংখ্য শহিদের রক্ত মাড়িয়ে পরাজিত ফ্যাসিস্টকে ধন বৈষম্য সৃষ্টির প্রতিযোগিতায় হার মানানোর ঘোষিত-অঘোষিত প্রতিযোগিতা চলছে। পালিয়ে যাওয়া প্রধানমন্ত্রীর পিয়ন ১৫ বছরে ৪০০ কোটি টাকার মালিক বনে গিয়েছিল বলে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন। এবার ৯ মাসও পার না হতেই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের নেতাদের আশীর্বাদে এক এপিএস ৪০০ কোটির

বেশি টাকার মালিক বনে গেছেন।

বিশ্বব্যাপকের মতে এ বছরই প্রায় ৩০ লাখ মানুষ অতিদরিদ্র হবে। কিছু মানুষের অতি ধনী হওয়ার সাথে এটা সম্পর্কিত। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ইতিমধ্যেই ৫ হাজার নব্য কোটিপতি এবং ৫ শতাধিক অতি ধনী তৈরি হয়েছে। এই ৯ মাসেই ৯০ হাজার কোটি টাকা পাচারের খবরও প্রকাশিত হয়েছে। ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের সময়ে বছরে ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ ছিল। এই প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য হয় আঁটসাঁটো পরিবেশে রাষ্ট্রীয় সম্ভ্রাস, না হয় অরাজক পরিবেশে পরিস্থিতিতে সংঘবদ্ধ মব সম্ভ্রাস চলতে দিতে হয়। তা চলছে। আবার এটাকে দেখিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের নামে প্রকৃত গণ আন্দোলন, শ্রমজীবী শোষিত মানুষের জন্য আন্দোলন দমনের ক্ষেত্রেও একে ব্যবহার করা যায়। সেটাও হচ্ছে, হবে।

ট্রেড ইউনিয়ন করতে যাওয়া এবং রিকশা শ্রমিকদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কারণে বাসদ-এর ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাও স্বাধীনতার সূচনাকালে ফ্যাসিবাদের হাতে করা বিশেষ ক্ষমতা নামক নিবর্তনমূলক আইনে। শাসন ব্যবস্থার মৌলিক বদল না ঘটলে কথিত

নয়া বন্দোবস্তের বহুরূপ তো ইতিমধ্যে দেখা হয়ে গেছে। ফলাফল—গোষ্ঠী বদল, লুটেরা বদল বা একই লুটেরার চেহারা বদল ইত্যাদি। জনগণ যেই তিমিরে সেই তিমিরে। ৫৪ বছরে বহুদলীয় শাসন, একদলীয় শাসন, সামরিক শাসন, সামরিকতন্ত্রের অধীনে ভোট ও গণভোটের শাসন, তদারকির ৩ মাস ও ২ বছর মেয়াদী শাসন, ১৯৭৫ এর সামরিক অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান, ব্যর্থ বিপ্লব প্রচেষ্টা, ১৯৮২-র সামরিক অভ্যুত্থান, ১৯৯০-এর গণ অভ্যুত্থান, ২০২৪ এর গণ অভ্যুত্থান, সরকারের বাইরে আন্তর্জাতিক যোগাযোগে ‘নন গভর্নমেন্ট’ (NGO) কাজে অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞদের দিয়ে পরিচালিত অন্তর্বর্তী সরকার-এত রকমফেরের পরেও গণপ্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে না। বলা হচ্ছে ফ্যাসিবাদ উত্থানের দরজা বন্ধ করতে হবে। পুরোনো চিন্তা, মত ও রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে হবে না। বয়স্কদের দিয়ে কাজ হবে না কারণ তারা ফ্যাসিবাদ উচ্ছেদে সফলকাম হননি। নতুনদের সামনে আনতে হবে। পরিবারতন্ত্র ভাঙতে হবে, যত মত ও যত পথ আছে সবগুলো ধারণ করতে হবে, অর্থাৎ সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে বহুত্ববাদকে মেনে নিতে হবে ইত্যাদি। যদিও মোল্লারা ইতিমধ্যে বহুত্ববাদ ছুড়ে ফেলে দিয়ে

একাভ্রবাদের ঘোষণা দিয়েছে।

রাষ্ট্রীয় এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তরুণদের দিয়ে নতুন দল হয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যে ২৪টি দল ঘোষিত হয়েছে। অতীতে সামরিক শাসকদের উত্থানপূর্বে এ জাতের আলামত দেখা যেত। এ সময়ের বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয়। প্রধান উপদেষ্টার আশীর্বাদপুষ্ট দল এনসিপি-র তর্জন, গর্জন, শানশওকত যত বাড়ছে, জনমনে গ্রহণযোগ্যতা তত-ই প্রশংসিত হচ্ছে। নিজেদের মধ্যেও সমন্বয়ের অভাব ও সূক্ষ্ম বিরোধের রেখা দিনে দিনে বড় হচ্ছে। এরা সংস্কার কাজ এগিয়ে নেওয়া ও ফ্যাসিবাদী খুনিদের বিচারকার্য সম্পন্ন না করে নির্বাচনে আগ্রহী নয়। সরকারের পক্ষ থেকেও নির্বাচনের তারিখ সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে ধোঁয়াশা কাটছে না। এরই মধ্যে নানা উটকো ঝামেলা যুক্ত হয়েছে। মিয়ানমারে যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে কথিত মানবিক করিডোর দেওয়া এবং প্রধান উপদেষ্টার সেনাদের প্রতি যুদ্ধের প্রস্ততির আহ্বান জানানো, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ উন্মাদনার মাঝে এক সাবেক সামরিক কর্তা বলে বসলেন, যুদ্ধ যদি লেগেই যায়, আমরা সাত রাজ্য দখলে নেওয়ার বিষয়ে এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

লুণ্ঠনের বুর্জোয়া ধারা ও ধর্মীয় মৌলবাদী ধারার বিপরীতে বাম বিকল্প রাজনৈতিক ধারাকে শক্তিশালী করণ –কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ

শোষণ বিরোধী আগামী
অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিতে
বামপন্থিরা প্রস্তুত হোন

কমরেড খালেকুজ্জামান

বাসদ-এর সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীদের
২১তম মিলনমেলা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর সমর্থক শুভানুধ্যায়ীদের ২১তম বার্ষিক মিলনমেলা ১৮ এপ্রিল '২৫ তোপখানা রোডস্থ বিএমএ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ।

সারা দেশের ৬ শতাধিক সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন বাম প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, চিকিৎসক, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাসদের কার্যক্রম, রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্পর্কে পরামর্শ, সমালোচনা



তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিশু-কিশোরদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি। তাদের কাছে এ যেন ঘরের বন্দিদশা থেকে মুক্ত বিহঙ্গের মতো বিচরণের উল্লাস, উচ্ছ্বাস, ছুটাছুটিতে ভরপুর।

মিলনমেলায় আলোচনা করেন বাসদের

উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, বাংলাদেশ জাসদের সভাপতি শরীফ নূরুল আখিয়া, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের

সাবেক অধ্যাপক আবিদুর রেজা, দৈনিক সমকালের উপদেষ্টা সম্পাদক আবু সাদ্দ খান, সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী জেড. আই. খান পান্না, গণতন্ত্রী পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক ডা. শহীদুল্লাহ সিকদার, বাংলাদেশ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

লুর্থনের বুর্জোয়া ধারা ও ধর্মীয় মৌলবাদী ধারার বিপরীতে বাম বিকল্প রাজনৈতিক ধারাকে শক্তিশালী করণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের ড্রেজারার খায়রুজ্জামান কামাল, সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব রশীদুল হাসান ও জনাব শেখ আহাদ আহম্মেদ, কৃষিবিদ গিয়াস উদ্দিন পাটোয়ারী, বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাসদের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস।

অনুষ্ঠানে আরও অনেকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সচিব জনাব সুজা উদ্দিন, বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব কুদরত-ই খুদা, শ্রমিক জোট নেতা মোশারফ হোসেন মন্টু, ডাকসুর সাবেক জিএস ডা. মুশতাক হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা ড. বীনা সিকদার, নারীনেত্রী বহি শিখা জামালী, আকবর খান, কৃষিবিদ নূর মিয়া, কৃষিবিদ ড. শামসুল হোসেন, কৃষিবিদ হারুন অর রশীদ আহমেদ বাবু, কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী, কৃষিবিদ মজিবুল হক চুন্নু, অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম, ব্যাংকার নূরুল আরশাদ চৌধুরী, অ্যাড. জহিরুল ইসলাম মোল্লা, স্থপতি সুব্রত সরকার, চারু শিল্পী পিন্টু বিল্লাহ প্রমুখ।

মিলন মেলায় কবিতা আবৃত্তি করেন জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি কবি মোহন রায়হান, কামরুজ্জামান ভূঁইয়া, প্রকৌশলী শম্পা বসু, শামীম পাটোয়ারী, তারিকুজ্জামান টরিক, টিপু চৌধুরী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন চারণ শিল্পী শাহিনা আক্তার, গোলাম মোস্তফা। নারায়ণগঞ্জ জেলা চারণের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে মিলন মেলার অনুষ্ঠান শুরু হয়। নৃত্য পরিবেশন করেন অশ্বষা মজুমদার ও সুজা সাহা।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, বিপ্লবী আন্দোলন একটা দীর্ঘ লড়াই। সমাজ বিকাশের ধারায়—আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ, দাস সমাজ, সামন্তীয় সমাজ, পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী সমাজ, সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী ব্যবস্থা দেখব। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ—মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং মানুষের সামনে হাজির করেছেন। মার্কস এঙ্গেলস প্রথম সমাজ বিকাশের ইতিহাসের নিয়ম ব্যাখ্যা করেছেন এবং এর ঐতিহাসিক অগ্রগতির কথাও তুলে ধরেছেন। তাঁরা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বৈজ্ঞানিক রূপকল্প হাজির করেছেন। বাস্তবে এই সমাজগুলো না দেখতে পারা কি তাদের ব্যর্থতা? ব্যর্থতা না। তারা মারা গেছেন কিন্তু তাদের সেই চিন্তাধারা নিয়ে সারা পৃথিবীর একদল মানুষ লড়াই করছে। তাতে সফলতা আছে, ব্যর্থও হচ্ছে, কিন্তু লড়াইটা চলছেই। জগতে বিজয়ের নিয়ম এটাই। এমন লড়াই চলবে, থামবে না।

কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। সমাজতন্ত্র তিনি দেখেননি। বিপ্লবের পর ১৪টা সাম্রাজ্যবাদী দেশ রাশিয়াকে আক্রমণ করেছিল এবং দেশের অভ্যন্তরে বলশেভিক পার্টি বিরোধী শক্তিও গৃহযুদ্ধ চালাতে থাকে। ১৯২২ সালে রাশিয়া শত্রুমুক্ত হয়। এটা মোকাবিলা করেছিলেন তিনি।

বিপ্লবী আন্দোলনকে অঙ্কের মতো করে তিনি হাজির করেছিলেন। লেনিন বিপ্লবের কিছু কাল পূর্বে বলেছিলেন আগামী ১০ বছরের মধ্যে তিনি কোনো বিপ্লব দেখছেন না। তিনিই আবার সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরে এসে বললেন, ৬ তারিখ বিপ্লব শুরু হলে একদিন আগে হবে, ৮ তারিখ হলে একদিন পরে হবে, ৭ তারিখ হলো সঠিক দিন যেদিন আক্রমণটা করতে হবে এবং ৭ তারিখেই বিপ্লব সফল হয়েছিল। কিন্তু তিনি একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মাণ করে যেতে পারেন নাই। ক্ষমতা দখলের পর বলশেভিক পার্টি প্রথম বললেন—যুদ্ধ অর্থনীতি, সেখান থেকে পরের ধাপে আসলেন নিউ ইকোনমিক পলিসিতে। এগুলি কোনটাই পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি না, সমাজতন্ত্রের অভিমুখে কার্যক্রম।

তাকে গুলি করা হয়েছিল, পরে স্ট্রোক করে মৃত্যুবরণ করলেন। এরপর কমরেড স্ট্যালিন সমাজতন্ত্রের কার্যক্রম শুরু করেন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মাণ করলেন। এ যাবতকালের মানব জাতির ইতিহাসে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আগে এ ধরনের ব্যবস্থা কেউ দেখে নাই। সমাজতন্ত্র যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা সেটা প্রমাণ করলেন কমরেড স্ট্যালিন। রাশিয়া একমাত্র দেশ যেখানে ৬ কোটি কপি সংবিধান জনগণের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল মতামত দেওয়ার জন্য। কোনো পুঁজিবাদী দেশ দেখাতে পারবে না যে এমন কিছু করেছে। রাশিয়ায় বিপ্লবের আগে মেয়েদের ভোটাধিকার ছিল না। দুইটা দেশে ছিল, শর্তসাপেক্ষ। গণতন্ত্রের সূতিকাগার ইংল্যান্ড আর গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আমেরিকায় ১৯১৭ সালের আগে মেয়েদের ভোটাধিকার ছিল না। রুশ বিপ্লবের সাথেই সাথেই মেয়েদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করেছিল।

১৯৩৭ সালের আগে কমরেড স্ট্যালিন বলেছেন, সমাজতন্ত্র কোন কল্পনার বিষয় নয়, এটা বাস্তব। এই দেশে কোন বেকার নাই, ভিক্ষুক নাই, পতিতা নাই। বুর্জোয়ারা খুব চেষ্টা করেছিল রাশিয়াতে এগুলো আছে কিনা তা দেখার জন্য। সারা পৃথিবীতে চলছিল মন্দা আর সোভিয়েত ইউনিয়নে তখন কোন বেকার নাই। মেয়েরা অর্থের অভাবে জীবিকার জন্য দেহ বিক্রি করে না। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, খেলাধুলাসহ সকল ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের নীতি ছিল নির্ধারিত মুষ্টিমেয় মানুষদের জন্য আর সোভিয়েত ইউনিয়ন করেছিল সকল মানুষের জন্য।

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া বিজ্ঞান, খেলাধুলায়, শিল্প-সাহিত্যে, মানব কল্যাণে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছিল। মাতৃগর্ভ থেকে সমাধি পর্যন্ত মানব জীবনের প্রবাহকে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং রোগ শোক মোকাবিলা করে আরামদায়ক করা যায় তা নিশ্চিত করেছিল রাশিয়া। কিন্তু একটা সময় গিয়ে ব্যবস্থাটা টিকল না।

মার্কসই বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র কোন স্থায়ী ব্যবস্থা না। এটা পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে যাওয়ার অন্তর্বর্তীকালীন একটি সময়। একারণেই পুঁজিবাদ সামন্ততন্ত্রে না ফিরতে পারলেও, সামন্ততন্ত্র দাস সমাজে না ফিরতে পারলেও সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদে ফিরতে পারে। কারণ এটা অন্তর্বর্তী কালীন ব্যবস্থা। যেহেতু পুঁজিবাদ তার নিজস্ব নিয়মে চলে তাই যদি পুঁজিবাদকে সমাজতন্ত্রের মধ্যে ঢোকানো হয় তাহলে সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকবে না। রাশিয়াতে তাই হয়েছিল। একইভাবে একটি বিপ্লবী দল যদি এই চলমান সংসারে একই চিন্তা, একই অভ্যাস বা একই ধরনের কর্মকাণ্ডের ভিতর দিয়ে চলে তাহলে বিপ্লবী সত্তা রক্ষা করা যায় না।

আমরা ১৯৮০ সালে দলের কাজ শুরু করেছিলাম। তখনকার দেশের পরিস্থিতি, বিশ্ব পরিস্থিতি, সার্বিক রাজনৈতিক অবস্থা যা ছিল আজ তেমন নাই। এই চলার পথে আমাদের সীমাবদ্ধতা ছিল না তাও না। কিন্তু আমরা এগুলো অতিক্রম করার চেষ্টা করেছি। ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করেছি। তবুও অনেক ঘাটতি থেকে যেতে পারে। সেগুলি পুনর্মূল্যায়ন করা, বারে বারে ফিরে দেখা, বহু মতের মধ্যে তাকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা আমরা করি।

শিশুরা এখানে এসেছে, তারা এখন শুধু বাবা মা-কে চেনে। মমতা, স্নেহ-প্রীতি তার পরিবারের বাইরে আছে এটা সে জানেও না, বোঝেও না। আমরা চেয়েছিলাম অন্তত এখানে এসে তারা দেখবে তাদের অন্যরাও ভালোবাসে, স্নেহ করে, মমতা দেয়। এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। একটি ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে বেড়ে ওঠার শিশুর চিন্তার যে বদ্ধতা তৈরি হয়, যে সংকীর্ণতা থেকে যায়, অন্তত একটা দিনের জন্য হলেও ভিন্ন পরিবেশ তাকে দিতে চেয়েছি। যেন সে বুঝতে

পারে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মমতা আছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মূল্যবোধ কাজ করে। আপন-পর ভেদাভেদ কিছু সময়ের জন্য হলেও ভুলে থাকতে পারে। আমরা সেই আয়োজন করতে পারিনি কিন্তু তারপরও আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। আজকের অনুষ্ঠানের এই জায়গাটা সেই পরিবেশের জন্য মানানসই নয়। বাইরে খোলামেলা পরিবেশ নাই। সে ধরনের পরিবেশ তৈরি করা এখনও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এতটুকু আমরা করতে পেরেছি যে এখানে সবাই সুশৃঙ্খল পরিবেশ রক্ষার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

আমাদের খাবার কম পড়েছে, কেউ টের পেয়েছেন? পান নাই। এটা কোন বুর্জোয়া দলের অনুষ্ঠান হলে মারামারি লেগে যেত। কিন্তু আমাদের কমরেডদের কারণে এই পরিস্থিতি আপনারা বুঝতেই পারেন নাই। অনেক কমরেড হয়তো এখনও না খেয়েই প্রোগ্রামে আছেন কিন্তু তারা খুশি যে আমরা অন্তত অতিথিদের খাওয়াতে পেরেছি। এটা একটা সংস্কৃতি। এটা এমনি এমনি হয় না। এটা সংগ্রামের অর্জন হিসেবে তৈরি হয়। এর আগেও আমরা এই মিলনমেলা করেছি, আগামী দিনেও করব। আপনাদের সহযোগিতা বা সহায়তার কথা বলব না, আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এটা আমাদের সাহস জোগায়, উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এখানে মাত্র ১৩ জন কথা বলেছেন। আমরা যদি ৩০ জনের কথা শুনতে পারতাম তাহলে আরও সমৃদ্ধ হতাম নানা দিক থেকে। আমাদের কথা বলার গুরুত্ব এখানে কম, কারণ আমরা তো সবসময়ই বলি। মানুষের সাথে মানুষের মিলন, পরিবার থেকে দল, দল থেকে সমাজ, এভাবে বৃহত্তর পরিসরে মানুষের মানব বন্ধন তৈরি হবে, শোষণ শ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণির বন্ধন তৈরি হবে। সেটাই অবশ্যম্ভাবী।

সরদার ফজলুল করিমকে তার এক ছাত্র জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, বিপ্লব কবে হবে, তারা তো বিপ্লব দেখতে পায় না। তিনি উত্তর করেছিলেন, প্রতিদিন ৪০ লক্ষ গার্মেন্টস কর্মীর ৮০ লক্ষ পায়ে বিপ্লব দেখতে পারবে। নারীরা আজ খেলার মাঠে, নানা দাপ্তরিক কাজে ভূমিকা রাখছে, তারা এখন আকাশে ওড়ার অপেক্ষায় আছে। সেখানে বিপ্লব দেখতে পারবে। ফলে মৌলবাদীরা যত লাফালাফি করুক, এদের ঘরে ঢোকানো যাবে না। ভাসুরের সামনে বের হওয়া, স্বামী ছাড়া বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ যে নারীর, সেই নারীদের দশ লাখ স্বামী ছাড়াই বিদেশে কাজ করতে চলে গিয়েছে। মৌলবাদীরা শ্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইছে। এগুলো আগেও চেষ্টা হয়েছে। বামপন্থা অর্থাৎ প্রগতির চিন্তা যখন মার খায়, ওরা তখন জেগে ওঠে। আবার প্রগতির চিন্তা জাগ্রত হলে এগুলি চাপা পড়ে। গোলাম আযম ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানে আদর্শের লড়াই নামে একটা বই লিখেছিলেন। সেখানে লিখেছেন এই আদর্শের লড়াই তিনটা বিষয় নিয়ে শুরু হয়েছে। একটা গণতন্ত্র, একটা ইসলাম আর একটা হলো সমাজতন্ত্র। বলেছেন, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র হলো ইসলামের শত্রু। তবে গণতন্ত্র যদি থাকে তবুও ইসলাম থাকে, কিন্তু সমাজতন্ত্র যদি আসে তাহলে আর ইসলাম থাকে না। ফলে যাদের ইমানের জোর আছে তাদের জিহাদে নামতে বলেছেন। ওই জিহাদি শক্তি ছিল আল বদর, আল শামস। তখন তো জনগণ তাদের পক্ষে দাঁড়ায়নি। ফলে আজও জনগণ তাদের পক্ষে যাবে না। তার প্রমাণস্বরূপ দেখবেন, জামায়াত যতগুলো কথা বলেছে এই সময়ে তার সবগুলো থেকেই সে পিছু হটছে। জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, নতুন স্বাধীনতা, সংবিধান পরিবর্তন এগুলো কিছুই টিকছে না। বলার চেষ্টা করছে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এগুলো নাকি আওয়ামী লীগের। এর একটাও আওয়ামী লীগের কথা না। এই কথাগুলো স্বাধীনতা সংগ্রামের ভেতর থেকে অর্জিত।

১৯৭৪ সালে জাসদের কর্মসূচিতে যদি ভ্রান্তি না থাকতো, প্রথম রাজনৈতিক উত্থানের শক্তির বিপর্যয় আমাদের অনেক ক্ষতি করে দিয়েছিল। তারপর ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে বিপ্লব প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। '৭৪ সালের বিপর্যয়ের পরে যদি মাওলানা ভাসানীকে সামনে রেখে সমস্ত বামপন্থি দল মিলে যুক্তফ্রন্ট হতো তাহলে শেখ মুজিব সামরিক অভ্যুত্থানে মারা যেত না, গণ অভ্যুত্থানে আওয়ামী সরকার উৎখাত হয়ে যেত। এরপর যদি দেখি '৯০ এর গণ অভ্যুত্থান, সেখানে আওয়ামী, বিএনপি এবং বামপন্থীদের তিনটা ধারায় আন্দোলন চলেছে। সেসময় অনেকটা রাশিয়ার মতো করেই নারী সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, কৃষক সংগঠন, আইনজীবীদের সংগঠন, পেশাজীবীদের সংগঠন যুক্ত হয়ে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতা বামপন্থীদের রক্ষা করা দরকার ছিল। এরশাদের অধীনে নির্বাচনে গিয়ে আন্দোলনের এই সংস্থাগুলোকে দুর্বল করে দিল।

আপনারা আওয়ামী-বিএনপি শাসন, জাতীয় পার্টির শাসন এবং জামায়াতে ইসলামীর কাণ্ডকার্তি দেখেছেন, সামরিক শাসনও দেখেছেন। এবার এনজিওদের সরকার দেখছেন। বাকি আছে শুধু বামপন্থীদের দেখা। আগামীদিনে তা নিশ্চয়ই দেখবেন।

ইউরোপ-আমেরিকাতে একটা বড় আন্দোলন, অভ্যুত্থানে দেড়শ দুইশ বছর লেগে যায় কিন্তু বাংলাদেশে বিশ থেকে তিরিশ বছরের বেশি যায় না। আগামী ২০-৩০ বছরের মধ্যে আবার একটা অভ্যুত্থান হবে। সেই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব আমরা এবং বাম শক্তি মিলে দিব। এখন অনেকের মনে হবে এমন কিছু তো দেখতে পারছি না। অনেক জিনিস আগে দেখা যায় না। '২৪ এর অভ্যুত্থান কি আগে দেখেছিলেন? আমরাই প্রথম আমাদের পত্রিকা ভ্যানগার্ডে লিখেছিলাম যে, গণ অভ্যুত্থান ছাড়া হাসিনাকে হটানো যাবে না। যদি আমাদের বামপন্থিরা বুর্জোয়াদের সাথে গিয়ে হাত না মিলাতো, বাম এবং লিবারেলরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকতো তাহলে ২৪ এর অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে এরাই থাকতো। সেটা তো হলো না। আমরা অনেকেই থাকি বা না থাকি, এটা লিখে রাখেন, বাংলাদেশের সমস্ত প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলিকে দেখা হয়ে গেছে। তাদের শাসনের অভিজ্ঞতা মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। আগামী দিনে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে অভ্যুত্থানের পর হয়তো নেতৃত্ব তখন আলোচনা করবেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কী হবে! সেই লক্ষ্যে এবং সেই অভ্যুত্থান সংগঠিত করতে এগিয়ে আসার জন্য সকল বাম, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, সেকুলার শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের আহ্বান জানান তিনি। নিজেদের মধ্যে রেয়ারেখি বাদানুবাদ করার সময় আর নাই, প্রয়োজনও নাই। বিভেদকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে, আন্দোলনের পরীক্ষায় দূর করুন। সৃষ্টিশীল জীবনীশক্তি দিয়ে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে মোকাবিলা করুন। নানা স্থানে, নানা স্তরে বিভক্তি শ্রমজীবী শোষিতদের এক কাতারভুক্ত করার ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় शामिल হোন। অর্ধেক জনসংখ্যার অবহেলিত নারীদের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে উদ্যোগে ব্রতী হোন। শিশু-কিশোর, তরুণদের মানুষ ও মনুষ্যত্ব বিকাশের রাস্তা দেখান। যুব সমাজকে পুঁজিবাদী-ভোগবাদী, স্বার্থপরতা ও রুচি বিকৃতি সম্পর্কে সচেতন করে যৌবনের প্রকৃত শক্তি সামর্থ্যের পথ দেখান। আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্যের প্রেরণায় নতুন ইতিহাস গড়ার কারিগর হোন। জয় অবশ্যম্ভাবী।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন-লুর্থনের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানে মানুষ যে স্বপ্ন দেখেছিল সে আশাবাদে ভাটা পড়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারিকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধ কর

জাতীয় বাজেটের ২৫% শিক্ষা খাতে বরাদ্দ; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিতের দাবি

অর্থ উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি পেশ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারিকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধ কর, জাতীয় বাজেটের ২৫% শিক্ষা খাতে বরাদ্দ; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিতের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এর উদ্যোগে ৮ মে '২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরায়ে বাংলার পাদদেশে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সড়কে মিছিল করে টিএসসি গিয়ে শেষ করে সংগঠনের ২ জন প্রতিনিধি সচিবালয়ে গিয়ে অর্থ উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন।

ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড়-র সভাপতিত্বে সমাবেশ বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি সুস্মিতা মরিয়ম, সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ, দপ্তর সম্পাদক অনিক কুমার দাস। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন।

স্মারকলিপিতে বলা হয়,

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নেন। আগামী ২ জুন (সম্ভাব্য) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট পেশ করবে সরকার। গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী সরকারের এটি প্রথম বাজেট। আমরা আশা করেছিলাম এই বাজেট প্রণয়নে দেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মতামত শোনা হবে এবং তার নিরিখে বাজেট প্রণীত হবে। কিন্তু বিগত সরকারগুলোর ন্যায় এই সরকারও কোন শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রতিনিধির মতামত শুনেছে বলে আমাদের জানা নেই। আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম বাজেট প্রণয়নে এই অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বদল



ঘটবে তা যেহেতু ঘটেনি তাই এই প্রশ্ন উঠেছে ছাত্র-শ্রমিক, জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে আকাজক্ষা গড়ে উঠেছে বাজেটে কী তার প্রতিফলন ঘটবে?

বাজেট শুধু বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়, এর মাধ্যমে সরকার ও রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে। এটি একটি দর্শনেরও প্রতিফলন বটে। একটি রাষ্ট্রের সরকার কোন দৃষ্টিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ উৎপাদনশীল জনকল্যাণকর খাতকে দেখছে বা গুরুত্ব দিচ্ছে সেটি প্রকাশ পায় বাজেটের মধ্যে দিয়ে। স্বাধীনতার ৫৪ বছরে প্রণীত প্রতিটি বাজেটের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কৃষি-শিল্পসহ উৎপাদনশীল খাতসমূহে বরাদ্দ কম। গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সংস্কারের অনেক আলাপ লক্ষ্য করলেও শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। পিরামিড আকৃতির এই শিক্ষা ব্যবস্থা শাসকদের দৃষ্টির

আড়ালেই রয়ে গেল। অনেকগুলো কমিশন করা হলেও শিক্ষা সংস্কার কমিশন করা হয়নি। অথচ সবচেয়ে বড় বৈষম্য রয়েছে এই শিক্ষা ব্যবস্থায়। বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রায় ৮৫ শতাংশই বেসরকারি ধারায় পরিচালিত হচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে অন্তর্বর্তী সরকারের কোন পদক্ষেপ নেই। ৫ আগস্ট '২৪ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তার অধিকাংশই উচ্চজ্বল মব ট্রায়াল এর ফল হিসেবে। যেমন, ২০২৪ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত, পাঠ্যবই থেকে 'আদিবাসী' গ্রাফিতি তুলে দেয়া, মৌলবাদী গোষ্ঠীর কাছে নতজানু হয়ে পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনের সমন্বয় কমিটি থেকে প্রগতিশীল শিক্ষকদের বাদ দেওয়া, সাত কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পৃথকীকরণ, নিবন্ধিত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত সবই করা হয়েছে মবের মুখে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, সারাদেশে অন্তত ২০ হাজার শিক্ষককে মব ভায়োলেন্সের মাধ্যমে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে, এর মধ্যে ৮০০ জন চাকরি ফিরে পেতে আদালতে গিয়েছে। শুধু ঢাকা শহরেই পদত্যাগে বাধ্য হয়েছে ২ শতাধিক শিক্ষক। এরা বেতন পাচ্ছেন না। কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষক চাকরিতে বহাল থাকলেও তাদেরকে ক্লাশ নিতে দেওয়া হচ্ছে না। এটা একটা জাতির জন্য খুবই লজ্জার। আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে দেখছি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল, একাডেমিক ভবন ও বিভিন্ন স্থাপনা থেকে দেশবরেণ্য শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, সাহিত্যিকদের নাম বাদ দেয়া হচ্ছে এবং সেগুলোতে নতুন করে নানা বিতর্কিত ব্যক্তিদের নামে নামকরণ করা হচ্ছে। একটা সফল গণ অভ্যুত্থানের পর এধরণের ঘটনা অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং এগুলো এই মুহূর্তেই বন্ধ হওয়া জরুরি। এই সংকট মোকাবিলা করতে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা দর্শন পরিবর্তন যেমন জরুরি তেমনি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে দৃঢ় থাকাটাও জরুরি বলেই মনে হয়েছে।

সর্বোপরি গোটা শিক্ষাব্যবস্থার এই জীর্ণ দশা থেকে মুক্তি পেতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। বিগত দশ বছরের শিক্ষা বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতি বছরই আনুপাতিক হারে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমেছে। ২০১৬-১৭ বর্ষে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ১৪.৩৯%; ১৭-১৮ বর্ষে বরাদ্দ ছিল ১২.৬০%; ১৮-১৯ বর্ষে বরাদ্দ ছিল ১১.৫৩%; ১৯-২০ বর্ষে বরাদ্দ ছিল ১১.৬৮%; ২০-২১ বর্ষে বরাদ্দ ছিল ১১.৬৯%; ২১-২২ বর্ষে বরাদ্দ ছিল ১১.৯২%; ২২-২৩ বর্ষে বরাদ্দ ছিল ১০.৭%; ২৩-২৪ বর্ষে বরাদ্দ ছিল ১১.৬%, ২৪-২৫ বর্ষে বরাদ্দ ছিল এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

নারী বিদ্বেষ ও নারীর প্রতি অবমাননা, সহিংসতা প্রতিরোধ কর

নারী অবমাননাকারী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িতদের বিচার কর

নারী বিদ্বেষী বক্তব্য প্রদান, অবমাননাকর ও সহিংস কর্মকাণ্ড পরিচালনা, অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্যদের অশালীন ভাষায় গালিগালাজ ও মানহানিকর বক্তব্য প্রদানের প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ৭ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, উগ্র ধর্মাত্মক মৌলবাদী গোষ্ঠী নারী কমিশন ও কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবি জানায় এবং নারী কমিশনের সদস্যসহ নারীদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ অবমাননা ও অমর্যাদাকর বক্তব্য প্রদান করে ঘৃণা ছড়ায়। শুধু তাই নয়, তারা দেশে সহিংস পরিবেশ সৃষ্টিরও হুমকি দেয়। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ হেফাজতে ইসলাম এবং উগ্র ধর্মাত্মক মৌলবাদী গোষ্ঠীর নারীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্যে উদ্বেগ প্রকাশ করে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, নারী-পুরুষ সবাই সমান মানবিক মর্যাদা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিদার। নারীদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য তাদের সম্মান ও অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে, যা গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও সংস্কৃতি বিনষ্ট করে। নারী বিদ্বেষ সমাজে বৈষম্যকে উসুকে দেয় এবং নারীদের শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র ও রাজনৈতিক, সামাজিক অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। এটি সমাজ প্রগতি ও ন্যায্যভিত্তিক সমাজ গঠনের পথে অন্তরায়। নারী বিদ্বেষী বক্তব্য একটা অপরাধ, কারণ এটি সামাজিক শান্তি বিনষ্ট করে এবং সহিংসতাকে



উৎসাহিত করে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানে 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং সমভাবে আইনের সুরক্ষা পাবেন।' এবং রাষ্ট্র নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করবে' ও 'নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব'—এ কথাগুলো বলা আছে। কিন্তু যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছে তারা নারীর

নিরাপত্তা, মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে পারছে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বিভিন্ন খাতে সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার ১১টি কমিশন গঠন করে, যার একটি হচ্ছে নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন। কমিশনের সদস্যরা আগামী দিনের জন্য সংস্কারের সুপারিশ তুলে ধরেছে যা রাজনৈতিক দলগুলো যাচাই-বাচাই করে গ্রহণ-বর্জন করবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ধর্মাত্মক গোষ্ঠী সমাজে নারীর চলাফেরার স্বাভাবিক পরিবেশ রাখছে না, বরং ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করছে। দেশের জনসংখ্যা অর্ধেক নারী আতঙ্কিত পরিবেশে তারা নিরাপত্তা হীনতায় ভোগে। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। তারা নারীকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে চায়। তারা নারীর অগ্রযাত্রাকে রুদ্ধ করবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের মানুষ অগণতান্ত্রিক কোন শক্তিকে গ্রহণ করেনি। গণতান্ত্রিক শক্তি সম্মিলিতভাবে তাকে প্রতিহত করবে।

বাম গণতান্ত্রিক জোট এ বিষয়ে সরকারের সুস্পষ্ট অবস্থান তুলে ধরে প্রেসনোটে প্রকাশের দাবি জানিয়েছে। একইসঙ্গে নারীবিদ্বেষী গোষ্ঠীকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

বামজোটের সমন্বয়ক ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদের (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশররফা মিশু, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শম্পা বসু, সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী, সমাবেশ পরিচালনা করেন বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নজরুল ইসলাম।

ছাত্র রাজনীতির আদর্শবাদী ও বিপ্লবী ধারাকে শক্তিশালী করুন

[সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠার চার দশক উপলক্ষে ১৩ ফেব্রুয়ারি '২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্রাস বিরোধী রাজু ভাস্কর্য পাদদেশে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রদত্ত বক্তব্য গত সংখ্যায় প্রথম কিস্তি ছাপা হয়েছে। এ সংখ্যায় দ্বিতীয় কিস্তি।—সম্পাদক]

অধ্যাপক জোবাইদা নাসরীন বলেন, একটি সফল গণ অভ্যুত্থানের পরে আজকের এই সমাবেশে আগত সকলকে জানাচ্ছি রক্তিম অভিযাদন।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট আন্দোলন সংগ্রামের চার দশক পালন করছে। যারা সংগ্রামে থাকে, যারা প্রতিনিয়ত জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই মোকাবিলায় প্রস্তুতি নেয়, তাদের কখনো অতীত হয় না। তাদের সংগ্রাম চলমান। আজকে এখানে যারা আছেন সবাই বলে ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যত আমি বলছি ছাত্ররা দেশের বর্তমান।

এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। পৃথিবীতে এই রকম ইতিহাস খুব কমই আছে, যেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় একটি রাষ্ট্রের জন্ম নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই ছিল দেশের পরবর্তী গণ অভ্যুত্থানের চালিকা শক্তি। এই দেশেই '২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে হয়েছে।

আজকে যারা সামনের সারিতে ও মঞ্চে বসে আছেন তাদের প্রত্যেককেই আমি ৪৭ বছর ধরে চিনি। লড়াই হচ্ছে একটা চলমান প্রবাহ। অতীতের লড়াইয়ের ফল বর্তমান এবং আগামীর স্বপ্ন। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বাংলাদেশে তাদের লড়াইয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশে কয়েকটি অভ্যুত্থান হয়েছে, বহু আন্দোলন-প্রতিবাদ হয়েছে কিন্তু সব সময় আমরা এক-ই মানুষকে দেখি না। সময়ের সাথে অনেক আন্দোলনের মুখ হারিয়ে যায়, নতুন মানুষ আসে। আন্দোলন, প্রতিবাদ, গণ অভ্যুত্থানের পর বেশিভাগ মানুষ ফিরে যায় ঘরে।

আমরা বিভিন্ন আন্দোলন-প্রতিবাদ দেখেছি কোটারি ভিত্তিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী নিপীড়িত হলে প্রতিবাদে শিক্ষক-ছাত্ররা রাস্তায় নামে ঠিক-ই কিন্তু দেখি না যখন প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুলের শিক্ষার্থী নিপীড়িত হয়। আমরা কয়েকদিন আগে দেখেছি এখানে আন্দোলনরত শিক্ষকদের গায়ে জল-কামান নিক্ষেপ করা হয়েছে। বাচ্চাসহ নারী শিক্ষক ছিটকে পড়েছিলেন সেই জল কামানের ধাক্কায়—কই কেউতো রাস্তায় নামেনি। শুধু প্রতিবাদ করেছে সামাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাসদ কিংবা কমিউনিস্ট পার্টি। সুতরাং কোথায় আমি প্রতিবাদ জারি রাখব, এগুলো রাজনীতির পাঠ।

আমি ওকে খুশি করার জন্য এই প্রতিবাদে আসলাম, সে আমার বোন বলে প্রতিবাদে আসলাম তা-হবে না। প্রতিবাদ-সংগ্রাম মানুষের জীবনে প্রতিদিনের বিষয়। প্রতিবাদ সংগ্রাম ভাড়া খাটা কাজ নয়। গোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য নয়, প্রতিবাদ সংগ্রাম যেখানেই যখন দরকার সেখানেই জারি রাখতে হয়। এজন্যই আমি শুধু সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের যারা জড়িত ছিলেন যুক্ত আছেন এখনও যারা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সমর্থন দিয়ে এই ছাত্র ফ্রন্টের ব্যানারে হোক ব্যানারের বাইরে হোক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন সকলকেই জানাচ্ছি রক্তিম অভিযাদন এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এই সমাবেশের কোলঘোষা রোকেয়া হল। ২৫ মার্চে এই রোকেয়া হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি হলে হানাদার বাহিনী আক্রমণ চালিয়েছিল। তৎকালীন ইকবাল হল যেটি আজকে শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক নামে পরিচিত, '৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানে সেখানে শহিদ হয়েছিলেন।

কারণ তৎকালীন ছাত্রনেতারা ইকবাল হলে বেশি থাকতেন। ইকবাল হল থেকেই তখন আন্দোলন পরিচালিত হতে। রোকেয়া হলের বীর নেতারা ডামি রাইফেল নিয়ে ট্রেনিং প্যারেড



করেছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছে তথ্য ছিল যে, এখানে গোলাবারুদ লুকানো আছে। আর জগন্নাথ হল টার্গেট হয়েছিল কারণ সেখানে অমুসলিম ছাত্ররা ছিল, কিন্তু এই রোকেয়া হল নিয়ে এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। আমার একটি বই এবার বই মেলায় প্রকাশিত হবে মুক্তিযুদ্ধে রোকেয়া হল।

এখন আমরা ভয়ের মধ্যে আছি। মুক্তিযুদ্ধ এখন কোথাও নাই। এই বাংলা একাডেমিতে যান '৫২ এর পরে '২৪, মুক্তিযুদ্ধ নেই। এর পিছনে একটা ঘৃণ্য চক্রান্ত আছে।

'২৪-এর অভ্যুত্থানের যে অঙ্গীকার, বৈষম্যহীনতা শুধু মুখের কথা নয়, শুধু একটি অভ্যুত্থানের বিষয় নয়। বৈষম্যহীনতার ভিত দেখাতে হবে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ তৈরির মধ্য দিয়ে। আজ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের দাবি কাদের? রোকেয়াকে এত ভয় কেন? কেন তাঁর ছবিতে চুন-কালি মাখানো হয়। কেন এদেশে নারীদের খেলা বন্ধ করা হয়? কেন জনপ্রিয় নায়িকারা শো-রুম উদ্বোধন করতে পারে না? একটি গোষ্ঠী দাবি তোলে সরকার সেটিকে অনুমোদন দেয়। এর জবাবদিহি সরকারকে করতেই হবে।

আমরা আয়না ঘরের ভয়াবহ চিত্র দেখেছি। গণহত্যা আওয়ামী লীগ সরকার চালিয়েছিল বলে তাকে দেশ ছেড়ে যেতে হয়েছে। এই সরকার যদি ফ্যাসিবাদের বীজ বপন করে তাকেও কিন্তু একইভাবে এই জনগণ বিদায় দিবে। আওয়ামী লীগ সরকার আমার বাসায় নিয়মিত হয়রানি চালিয়েছে, ছাত্রলীগকে দিয়ে আমাকে নির্বাতন করেছে। আমি যখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পড়তাম তখন কুকুরের গায়ে আমার নাম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপরও আমরা রাজপথে ছিলাম। আমাদের আন্দোলন-সংগ্রাম কোনো সময়ভিত্তিক না।

আমরা আওয়ামী লীগ সরকারের সময় রাজপথে বজ্র কণ্ঠ ছিলাম। ওই সরকারকে বিদায় করা হয়েছে যে, শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমেছে। আহতরা এখনও হাসপাতালে কাতরাচ্ছে, তারা চিকিৎসা পাচ্ছে না। এই সরকারের বিরুদ্ধে তারা বিক্ষোভ করছে। শ্রমিক, কৃষক যারা এই আন্দোলনে ছিল, জীবন দিয়েছে। সরকার তাদের দাবি থেকে দূরে সরে গেছে। আমরা দেখেছি মানুষ গণ অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ করে আর একদল সেই মুক্তিযুদ্ধ, গণ অভ্যুত্থানের মালিকানা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে। আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগ সরকারেও কীভাবে মুক্তিযুদ্ধকে বেচাকেনা করেছে। কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের একচেটিয়া মালিকানা তাদের দখলে নেয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ হতে দেয়নি।

দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মালিক বাংলাদেশের মানুষ; তাই মুক্তিযুদ্ধের অর্জনে কোনো সরকার হাত দিতে পারে না। এটা সুস্পষ্ট অবস্থান আমাদের। আমরা দেখছি আগস্টের এই আন্দোলনের মালিকানা থেকে

বঞ্চিত হয়েছে শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষ। যে কারণে আমরা দেখেছি মবোক্রেসি হচ্ছে, খোদ রাষ্ট্র মবোক্রেসি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বুলডোজারতন্ত্র কায়ম করছে। মব সম্পর্কে খোদ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলছেন, রাস্তার মানুষজন-ই নাকি আন্দোলনকারীদের তুলে দিবে! তাহলে আপনি দায়িত্বে আছেন কেন?

পুলিশের পোশাক বদল করে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে করতে পারবেন না। সরকারের প্যারালাল সরকার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আমরা দাসখত দিয়ে এখানে কথা বলতে আসিনি। ভয়-ভীতি দেখিয়ে থামানো যাবে না। অতীতে অনেকে তাই করেছে কোনো লাভ হয়নি। আপনাদেরও মনে রাখতে হবে, তকমার রাজনীতি করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। বলেছে, বামাতি-জামাতি, বিএনপি। মনে রাখবেন বৈষম্য বপনের বীজ হলো তকমার রাজনীতি। আপনারা বলছেন, একে রাখ, তাকে সরাও; একে জায়গা দেওয়া যাবে না, কারণ এ ছাত্রলীগ করত, ওকে জায়গা দেওয়া যাবে না, কারণ সে আমাদের গ্রুপের সঙ্গে আমাদের দলের সঙ্গে দাসখত দেয়নি বা হ্যাঁ-হ্যাঁ বলে না।

আয়না ঘরের দৃশ্য মানুষ দেখেছে। মায়ের ডাকের সভাপতি বলেছে আমাকে ডাকা হয়নি। যারা গুমের শিকার হয়েছে তাদের স্বজনদের ডাকা হয়নি। তার মানে—সরকার তাদের নিয়ে গেছে, যারা সরকারের পক্ষে কথা বলবে তাদের। যারা সত্য কথা বলবে তাদের ডাকা হয়নি। এ আয়নাঘর নিয়েও এখন অন্য রাজনীতি গুরু হয়েছে। আমরা সকল ধরনের গুম, অপহরণ-নিপীড়ন এবং শোষণে বিপক্ষে আছি। বৈষম্যের বীজ কোথায়? বৈষম্যের বীজ থাকে অর্থনীতিতে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে, বীজ থাকে নারী বিদ্বেষে। আছে সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দেয়ার রাজনীতিতে, যারা ওই মুক্তিযুদ্ধকে ভুলিয়ে দেওয়ার টার্গেট করেছে।

তিনি আরও বলেন, সংবিধানের সংস্কার কমিটির প্রস্তাবের রিপোর্ট পড়েছি। নির্বাচন কমিশন সংস্কার রিপোর্ট কাদের নিয়ে করা হয়েছে? তারা ২২টি ওয়ার্কশপ করেছে, যার ১৭টি ঢাকা শহরে ৫টি হয়েছে ঢাকার বাইরে। শ্রমিক-কৃষক, মেহনতি মানুষ, যারা এদেশের সকল মুক্তি সংগ্রাম রচনা করেছিল, তারা কোথাও নাই। সংবিধান সংস্কার কমিটির কাছেও এদের গুরুত্ব নাই। তাহলে স্পষ্ট বুঝা যায় সংস্কার হচ্ছে কাদের স্বার্থে। যে কমিশন হয়েছে সেখানে নারী নেই, সংখ্যালঘু নাই কেন?

সংবিধান সংস্কার কমিটির প্রস্তাবে মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র—ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র তুলে দিয়ে বহুত্ববাদের কথা বলা হয়েছে। বহুত্ববাদে আমরা দেখলাম—সরকার গ্রাফিতির একটি পাতা আদিবাসী লেখা রাখতে পারল না! বহুত্ববাদ কীভাবে কায়ম করবে? ৫ জন দাঁড়ালে আপনারা গ্রাফিতি থেকে পাতা ছিঁড়ে ফেলেন। বাংলাদেশে ১ শতাংশ জনগোষ্ঠী আদিবাসী তাদের আপনারা মেনে নিতে পারেননি, গ্রাফিতি পুনঃস্থাপন

করেনি। এতে প্রমাণ করেছেন আপনি একটি ধর্মাত্ম গোষ্ঠীর প্রতিনিধি।

তিনি আরও বলেন, গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ছিল ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূর করা। আপনারা যে পথে হাঁটছেন সে পথে বৈষম্য দূর হবে না। নতুন ধরনের বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। আপনারা যারা দেশ চালাচ্ছেন—তাদের সমালোচনা করলে স্বৈরাচারের দোসর বানিয়ে দিচ্ছেন। '৪৭-এর পর হিন্দুদের বলা হয়েছে 'শত্রু', '২৪ সালে এসে বলছেন ডেভিল। এই ডেভিল-এঞ্জেল ঠিক করবে শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষ। ন্যায় বিচারের দায় জনগণ আপনাদের দেয়নি। জনগণের কাছে কারা আপনজন কারা শত্রু তারা ঠিক করবে। এদেশে প্রতিটি আন্দোলনে যারা রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে, বুক চিতিয়ে বলছে 'জান দিব তবু ধান দিব না', তারাই নির্ধারণ করবে কে ডেভিল আর কারা মিত্র। তকমার রাজনীতি সমাজে বেশি দিন ধরে চলতে পারে না।

আপনারা মুক্তিযুদ্ধকে কেন অভ্যুত্থানের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন? যারা গ্রাফিতি সরিয়েছেন তারা নিজেদের নিপীড়নকে বৈধ করতে অন্যদের নিপীড়ক তকমা এঁটে দিচ্ছেন। যারা আয়নাঘর, গুম-নিপীড়ন করেছে তারা অবশ্যই ফ্যাসিস্ট কিন্তু যারা লালনের প্রোগ্রাম হতে দিচ্ছে না, বাউলদের উপর আক্রমণ করছে, মাজার ভাঙছে, বাড়িঘর লুট করছে, মন্দির আন্যান্যদের উপাসনালয় ভাঙছে তারা কী? তাদের কেন ছোঁড়ার করছে না। এই অঞ্চল পির-আউলিয়ার, বাউল সাধকের, ধর্ম বিশ্বাসীদের। এখানে বহুত্ববাদের সংস্কৃতি চালু আছে।

বিশ্বের গবেষকরা এখানে এসে লালনের উপর গবেষণা করে, মাইজভান্ডারিকে বুঝতে চায়, জারি-সারি গান গায়। এখানে শুধু সংস্কারের কথা বললেই হবে না, এ দেশের মানুষ শোনে মিলনের জারি, মুক্তিযুদ্ধের বীরগাঁথা, ৩০ লাখ শহিদের জীবন দানের ইতিহাস, শোনে মাঝিমাল্লার ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালি।

তাই এদেশের মানুষকে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আমি বলব—আমাদের সকলের লড়াই হবে যেখানে আধিপত্যবাদ সেখানে, যেখানে শোষণ সেখানে, যেখানে অন্যকে অপমান করা হয় সেখানে, যেখানে আদিবাসীদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় সেখানে।

এখানে যারা ছাত্র ফ্রন্টের কর্মীরা আছে, যারা এখন ছাত্র, যাদের আমি আজকেই প্রথম দেখছি তাদের আহ্বান জানাচ্ছি—আমরা সারা জীবন রাজপথেই থাকব, যত দিন আমাদের অধিকার আদায় না হয়। তোমরাই স্বপ্ন ফেরি করছ, স্বপ্ন দেখছ এবং দেখাচ্ছে। তোমাদের এই স্বপ্ন কিন্তু ফানুস নয়, চশমা স্বপ্ন নয়। স্বপ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেস্টরুম, গণরুম নামে যে রকমের আয়নাঘর প্রতিস্থাপিত হয়েছিল সবগুলোকে ধ্বংস করে শিক্ষার্থীদের আবাসনের অধিকার, বিনা মূল্যে পড়ার অধিকার শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার এই স্বপ্ন তোমরাই ফেরি করবে। এখানে যারা এসেছে, তারা শুধু সুনবার জন্য আসোনি দায়িত্ব বুঝে নিতে এসেছে। দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য এসেছে।

তোমরা আজকে শুধু অংশগ্রহণকারী নও। তোমরা একেকজন স্বপ্ন ফেরি করার পাশাপাশি স্বপ্নকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুক্ত থাকবে। সেই স্বপ্ন শোষণের ও শোষণের বীজকে উপড়ে ফেলার স্বপ্ন। যে ধর্মত্বতা, যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প ছড়ানো হচ্ছে ঘৃণার রাজনীতি ছড়ানো হচ্ছে এই সমাবেশ থেকে আমরা শপথ নিব সেগুলো উৎপাটনের। তোমরা আজকের সমাবেশের মূল মন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে যাবে—যেখানেই এগুলো দেখবে সেখানেই প্রতিরোধ করবে।

ধন্যবাদ সকলকে।

মে দিবস : এক প্রেরণার নাম

১৮৮৬ সাল থেকে ২০২৫। বছরের হিসেবে ১৩৯ বছর। এই সময়কালে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে দিনটা স্বপ্নের বার্তা আর সংগ্রামের পতাকা নিয়ে শ্রমজীবী মানুষ পালন করে তা হলো মে দিবস। গোটা পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে লিঙ্গ-ধর্ম, বর্ণ-ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে কত পার্থক্য। কিন্তু মে দিবস তাদেরকে অধিকারের চেতনায় ঐক্যের বাঁধনে বেধেছে।

এমন কোন দিনের কথা পৃথিবীর কোথাও কেউ ভাবতেই পারবেন না যে দিনটা শ্রমিকের সহায়তা ছাড়া তিনি কাটিয়ে দেবেন। শ্রম যারা দেয় বা শ্রম করে জীবন নির্বাহ করে তাদেরকে শ্রমিক বলা হয়। এই শ্রমিকরাই গড়ে তুলছে সম্পদ ও সভ্যতা। কিন্তু দেশে দেশে সম্পদ বাড়লেও সম্পদ তৈরির অন্যতম কারিগর শ্রমিকরা কি তার সুফল পায়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম।

মে দিবসের দাবি ছিল ৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম আর ৮ ঘণ্টা জীবন বিকাশের জন্য বিনোদন চাই। মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কাজ যেমন দরকারি, জীবনের ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য অবসরটাও তেমনি প্রয়োজন। শিল্প বিপ্লব উৎপাদন বৃদ্ধির নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে, প্রয়োজন হয়েছে বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের। জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে ১৪/১৬ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য হতে লাগলো শ্রমজীবী মানুষেরা। মালিকরা মুনাফা বাড়াতে শ্রম ঘণ্টা বাড়ানোর জন্য শ্রমিকদের উপর যে চাপ প্রয়োগ করতো তা শ্রমিকদের জীবন একেবারে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। ফ্রান্স-জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া-আমেরিকা সর্বত্রই কর্ম ঘণ্টা কমানোর দাবিতে বড় বড় শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকরা রাজপথে নেমে এসেছিল। ১৮৮৬ সালে ৮ ঘণ্টা কর্ম দিবসের দাবি তাই কোন তাৎক্ষণিক দাবিতে গড়ে উঠা আকস্মিক আন্দোলন ছিল না। ৮ ঘণ্টা কর্ম সময়ের দাবিতে ১৮৮৬ সালের ১ মে ও ৪ মে আন্দোলন এবং শ্রমিক নেতাদের ফাঁসির ঘটনায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই ইন্টারন্যাশনাল সোশালিস্ট কংগ্রেস ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। ১৯১৯ সালে আইএল ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৮ ঘণ্টা কর্ম দিবস ও ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে মে দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয় এবং জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

একটা প্রশ্ন বারবার জেগে উঠে, শ্রমিকের শ্রমে উৎপাদিত হয় ব্যবহার উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী কিন্তু তা ভোগ করার অধিকার শ্রমিকের কতটুকু? অর্থনীতির প্রতিটি সূচকের উন্নতি ঘটানোর পিছনেই থাকে শ্রমিকের ঘাম। কিন্তু সবচেয়ে কম পুষ্টি, কম শিক্ষা, কম স্বাস্থ্য সুবিধা, কম



বিশ্রাম, কম নিরাপত্তা যেন শ্রমিকদের জন্যই বরাদ্দ। অথচ সারা বিশ্বেই খাদ্য উৎপাদনসহ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়ছে। বাংলাদেশেও জিডিপি বৃদ্ধির হার, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পরিমান, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন যত বাড়ছে তার সাথে এ কথাটাও যুক্ত হয়ে আছে বাংলাদেশ সস্তা শ্রমিকের দেশ। শ্রমিকের মজুরি কম তার কারণ নাকি বাংলাদেশের শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম। কিন্তু উৎপাদনশীলতা শুধুমাত্র শ্রমিকের শ্রমশক্তির উপর নির্ভর করে না। মেশিন, ম্যানেজমেন্ট এবং ম্যানপাওয়ার এই তিন এম যুক্ত আছে উৎপাদনশীলতার সাথে। একটি সহজ উদাহরণ থেকেও বিষয়টা বোঝা যাবে। রিকশা চালক অনেক পরিশ্রমী কিন্তু তার চেয়ে কম পরিশ্রম করেও সিএনজি চালকের উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি। শিক্ষিত শ্রমিক, প্রশিক্ষিত শ্রমিক, দক্ষ শ্রমিক যাই বলি না কেন শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন করতে হলে প্রয়োজন শ্রমিকের আয় এবং অবসর। আয় বাড়লে খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণ বাড়বে এবং অবসর সময় পেলেই তো শ্রমিক তার দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পাবে। তা যেমন সমাজের অগ্রগতি সৃষ্টি করবে তেমনি বৈষম্য কমিয়ে আনতে সহায়তা করবে। কিন্তু শোষণ থাকলে তা তো সম্ভব নয়। এর ফলে একদল মানুষ যারা উৎপাদন যন্ত্র যেমন কারখানা ও পুঁজির মালিক তাঁরা দিন দিন ফুলে ফেপে উঠে আর শ্রম শক্তির মালিক শ্রমিক, সে হারায় তার কর্ম শক্তি। শোষণমূলক সমাজ যেমন বঞ্চিত করে শ্রমজীবীকে তেমনি জন্ম দেয় বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের। মে দিবসের সংগ্রাম ছিল তেমনি এক বিদ্রোহ যা শুধু শ্রমিকদের দাবিতে নয় সমাজের বিকাশের প্রয়োজনে সংঘটিত হয়েছিল। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে অগাস্ট স্পাইস যে ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন তা আজো আমাদেরকে আলোড়িত করে। তিনি বলেছিলেন, The time will come when our silence will be more powerful than the voices you strangle today.

একটা বিষয় স্পষ্ট যে, অর্থনীতির প্রতিটি সূচকের উন্নতি ঘটানোর পিছনেই থাকে শ্রমিকের ঘাম। কিন্তু সবচেয়ে কম পুষ্টি, কম শিক্ষা, কম স্বাস্থ্য সুবিধা, কম বিশ্রাম, কম নিরাপত্তা যেন শ্রমিকদের জন্যই বরাদ্দ। বাংলাদেশেও জিডিপি বৃদ্ধির হার, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পরিমান, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন যত বাড়ছে তার সাথে এ কথাটাও যুক্ত হয়ে আছে বাংলাদেশ সস্তা শ্রমিকের দেশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সত্ত্বেও শ্রম শোষণ বন্ধ না হলে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে বিপুল সম্পদের পাহাড় জমতে থাকবে। ৮ জন অতি ধনীরা হাতে বিশ্বের অর্ধেক মানুষের সম্পদের সমান সম্পদ দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না শোষণ কত আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে। আফ্রিকার কয়লা, লোহা, মধ্যপ্রাচ্যের তেল, ল্যাটিন আমেরিকার কফি আর এশিয়ার শ্রমিক সবই তো শোষণ লুণ্ঠনের জালে আবদ্ধ। করোনা মহামারির সংক্রমণ আর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নামে রোবট নির্ভর শিল্প, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সবই বৈষম্যকে প্রকট করে তুলছে। বাংলাদেশ ৭ কোটি ৪০ লাখ শ্রমজীবীদের দেশ। এদেশে শ্রমিকের জীবনমান উন্নত না করে কোন উন্নয়ন স্থায়ী ও মানবিক হবে না।

পৃথিবীতে যুদ্ধ হয় প্রাকৃতিক সম্পদ দখলের জন্য। বাজার দখলের জন্য হয়েছিল দুটি ভয়ংকর বিশ্বযুদ্ধ। সম্পদ তৈরি করে শ্রমিক, যুদ্ধের অস্ত্রও তৈরি করে শ্রমিক আবার যুদ্ধে জীবন দেয় শ্রমিকের সন্তান। যুদ্ধে ধ্বংস হয় সম্পদ, ক্ষতিগ্রস্ত হয় অর্থনীতি। তেমনি ঘটনা ঘটে মহামারীর সময়। যুদ্ধ অথবা মহামারির পর পৃথিবী যে ঘুরে দাঁড়ায় তা আবার শ্রমিকের শ্রমের ফলেই। যুদ্ধের বলি হয় শ্রমজীবী মানুষ, দ্রব্যমূল্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয় শ্রমজীবীরাই বেশি। বর্তমানেও যে নতুন শ্রম পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে তাতে উৎপাদন বাড়বে বিপুল কিন্তু এর ফলে বেকারত্বের সংখ্যাও বাড়বে পাল্লা দিয়ে। নতুন ধরনের কাজে নতুন দক্ষতার দরকার হবে।

প্লাটফর্ম ইকনোমি এবং গিগ ইকনোমি নামক নতুন ধরনের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ৪৫০ ধরনের কাজ আছে এবং আরও নতুন নতুন কর্ম ক্ষেত্র ও কাজের ধরন তৈরি হচ্ছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের ধরন ও শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে, দেশের ৪৬ সেক্টরের মজুরি বোর্ড দিয়ে সকল শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। নতুন নতুন যে সব কর্মক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে শ্রম আইন ও বিধি দ্বারা সেসব খাতের শ্রমিকদের সুরক্ষা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, গিগ ইকনোমি, প্লাটফর্ম ইকনোমির যুগে শ্রমিকের সংজ্ঞা, কাজের নিশ্চয়তা, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, কর্ম সময় আর ন্যায্য মজুরি, মজুরি বৈষম্য, পেনশন, মাতৃ ত্বকালীন অধিকারের সাম্যসহ নতুন নতুন বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে মে দিবসের চেতনায় নতুন করে ভাবতে হবে সমস্যাগুলোকে।

বাংলাদেশ এক অর্থে আন্দোলনের দেশ। আর এই দেশের প্রতিটি আন্দোলনে জীবন ও রক্ত দিয়েছে শ্রমিকেরা। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে, ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে, ১৯৯০ সালের গণ অভ্যুত্থানে এবং সর্বশেষ ২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থান কোথায় নেই শ্রমিকের অংশগ্রহণ ও জীবনদানের ঘটনা? বৈষম্যের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থানের শ্রমিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রমাণ করে বৈষম্যের বেদনা শ্রমিকদের জীবনে কত তীব্র। মে দিবসের চেতনায় শ্রমিকদের জীবন থেকে এই বৈষম্য দূর করার অঙ্গীকার ঘোষিত হোক।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে মে দিবস পালিত

১৩৯তম মে দিবস উপলক্ষে ১ মে ’২৫, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন, ন্যায্য মজুরি, সকল শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, শ্রমিক নিপীড়ন বন্ধ এবং সেলিম মাহমুদ,আল কাদেরি জয়, মিরাজ উদ্দিন, সীমা আক্তার, রোকন উদ্দিনসহ বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেপ্তারকৃত শ্রমিক নেতাদের মুক্তির দাবিতে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জুলফিকার আলী, আইন বিষয়কসম্পাদক বিমল চন্দ্র সাহা, সদস্য আফজাল হোসেন, রতন মিয়া প্রমুখ। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে সারদেশের মে দিবস পালিত হয়।

করিডোর প্রদান ও নিউমিরিং টার্মিনাল ইজারার চক্রান্ত রুখো

নবম পৃষ্ঠার পর

পরিচালনার ভার বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেশের স্বার্থবিরোধী। দেশের টাকায় সবকিছু করে এখন বিদেশিদের হাতে টার্মিনালটি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত চক্রান্তমূলক।

নেতুবন্দ বলেন, আরাকানে মানবিক করিডর দেওয়ার সিদ্ধান্ত একটি স্পর্শকাতর বিষয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা ছাড়া এ ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়ে সরকার একক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

এ ছাড়া কাতারের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে সেখানে সমরাস্ত্রের যন্ত্রাংশ তৈরির বিনিয়োগের জন্য সরকারের আহ্বানের নিন্দা জানান এবং এ ধনের উদ্যোগ থেকে সরে আসার দাবি জানান বক্তারা।

বাম বিকল্প রাজনৈতিক ধারাকে শক্তিশালী করুন

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন হলেও যেহেতু একই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বহাল আছে তাতে অন্য কোন প্রত্যাশার সুযোগ নেই। এর জন্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। সেটিই এখন আমাদের করণীয়।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ইসরায়েলের-ফিলিস্তিনে নির্মম হত্যযজ্ঞ, মার্কিন-চীন অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রভাবে বিশ্ব অস্থিতিশীল। বিশেষজ্ঞরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কাও করছেন। বাংলাদেশকে ঘিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতের কৌশলগত স্বার্থ জড়িত। মিয়ানমারে সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশকে ‘করিডোর’ হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে, যা ভবিষ্যতে আমাদের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিবে।

তিনি আরও বলেন, অভ্যুত্থান একই শ্রেণির

অভ্যুত্তরে ক্ষমতার হাত বদল, তাই অপরাংশকে উৎখাত করলেও শোষণমূলক ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার নিজেদের শক্তি সংহত করতে সংস্কারের নামে সময়ক্ষেপণ করছে।

গত ৮ মাসে বাজার সিডিকেট ভাঙা, দুর্নীতিবাজদের শাস্তি প্রদান বা বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনতে পারেনি। এরাও ব্যর্থতার মজুদ বাড়িয়ে চলছে। বর্তমান সরকার তাদের করণীয় কাজে মনোযোগ না দিয়ে একতিয়া বহির্ভূত বিয়য়ে হস্তক্ষেপ করছে।

প্রশাসন ও অর্থনীতিতে সামরিক কর্মকর্তাদের এবং প্রবাসের নাগরিকদের নিয়োগ বাড়ছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বলই করবে।

বামপন্থিদের বিভক্তি পুরনো। ’৯০-এর দশক ও ২০০৭-এর ওয়ান ইলেভেনের সময় বামপন্থিরা

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে বাসদের মতামত

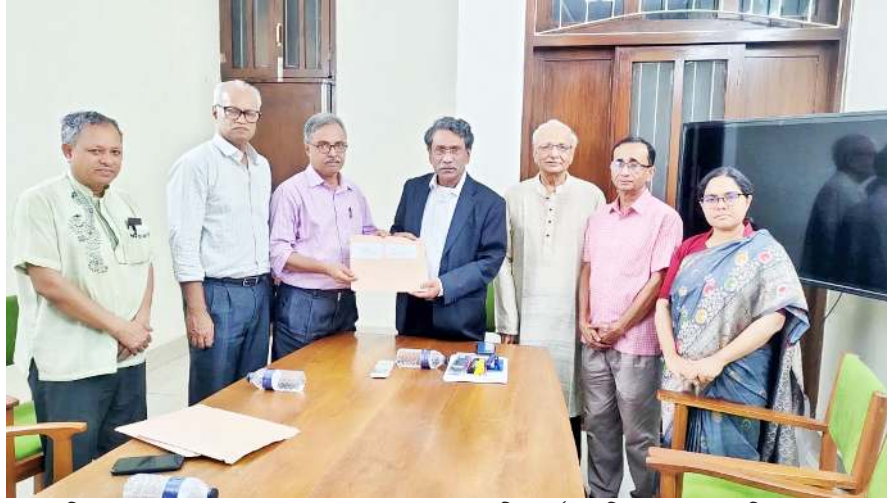
১৬ এপ্রিল ২০২৫ বিকেলে ৫টি সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট ও সুপারিশের উপর বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের লিখিত মতামত সংসদ ভবনস্থ এলইডি হলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রিয়াজ ও সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদারের নিকট জমা দেওয়া হয়। বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস, সদস্য জুলফিকার আলী ও প্রকৌশলী শম্পা বসু।

ঐকমত্য কমিশনে বাসদের মতামত

গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা আমাদের দীর্ঘদিনের। নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গ হলেও যখনই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ করেছে, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করেছে, দমন পীড়নের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার চেষ্টা করেছে তখন ফুঁসে উঠেছে জনগণ। সে কারণেই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এবং পরে অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী এবং ফ্যাসিস্ট শাসকদেরকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য গণ অভ্যুত্থানের প্রয়োজন হয়েছে। ১৯৬৯, '৯০ এবং ২০২৪-এর গণ অভ্যুত্থানের মধ্যে ঐক্যের জায়গাটা এখানেই। কিন্তু প্রতিরোধে, অংশগ্রহণে, জীবনদানে অর্থাৎ আন্দোলনের তীব্রতায় এবং ছাত্র-শ্রমিক-জনতার মিলিত শক্তির সামনে দাঁড়াতে না পেরে শাসক গোষ্ঠীর সদলবলে পলায়নের কারণে ২০২৪ এর গণ অভ্যুত্থান অপর দুটির তুলনায় এক অনন্য উচ্চতায় অবস্থান করে। শুধু বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীর শাসকদের বুকে কাঁপন ধরানো আর অত্যাচারিত জনগণের বুকে সাহস জাগাবার জন্য এই অভ্যুত্থান একটা প্রতীক হয়ে থাকবে।

ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, আন্দোলন যত তীব্র হয় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও ততই বাড়তে থাকে। জুলাই আগস্টের আন্দোলন তাই জনগণের প্রত্যাশাকে অনেক বড় করে দিয়েছে।

বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের দাবি নিয়ে নানা স্তরে এবং নানা পর্যায়ে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয়েছে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ অভ্যুত্থান। তীব্র রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদী সরকারকে উচ্ছেদ করার মাধ্যমে মানুষ শুধু বিজয়ী হয়েছে তাই নয়, তাদের দাবির যৌক্তিকতাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে শুধু রাজনৈতিক দলসমূহ নয়, সমাজের সকল স্তরের মানুষের বিপুল আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে অভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কাছে। আপনারা নিশ্চয়ই অনুভব করছেন যে, গণমানুষের প্রত্যাশার চাপ বিপুল। সব আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রীভূত রূপ হিসেবে, দেশে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এই আকাঙ্ক্ষা মানুষের দীর্ঘদিনের। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলে সৃষ্ট, অবাধ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন যেমন দরকার, তেমনি দরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপযোগী শাসন-প্রশাসন, আইনকানুন, বিধি-বিধান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিচার, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, সামরিক-বেসামরিক প্রতিষ্ঠানসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ব্যবস্থা। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা মনে করি, জনমতের সঠিক প্রতিফলন, জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখার মতো নির্বাচন ব্যবস্থা তৈরি করতে হলে প্রয়োজন নির্বাচনের উপর ক্ষমতাসীন দলের ও সরকার প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করা, টাকা, পেশিজন্তির প্রভাব এবং আঞ্চলিকতা-সাম্প্রদায়িকতাকে নির্বাচনে ব্যবহার বন্ধ করা। আমরা মনে করি, এই কঠিন অথচ প্রয়োজনীয় কাজ করতে সরকারের সামর্থ্য, সময় এবং পদক্ষেপ নিয়ে



গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্র গড়ে তোলার যে আকুতি প্রকাশ পেয়েছে তার প্রতিফলন হিসেবে সংস্কার কমিশন গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। স্বাধীনতার পর অনেক কমিশন গঠন ও সুপারিশ দেখা গেলেও এবারের বিস্তৃত ভাবে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রকাশ ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। এই প্রয়োজনীয় অথচ কষ্টসাধ্য কাজ করার জন্য আমরা কমিশন প্রধানসহ কমিশন সদস্য এবং সহযোগীদের ধন্যবাদ জানাই।

আমরা দেখেছি, প্রতিটি কমিশনের প্রতিবেদনে অনেকগুলো মৌলিক এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। এই সুপারিশ প্রণয়নে অতীতের অনেক রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব বিষয় গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে।

কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য আমাদেরকে একটি ছক সরবরাহ করা হয়েছিল যেখানে একমত, একমত নই এবং আংশিক একমত ঘরে টিক চিহ্ন দেয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

সংস্কার কখন এবং কী পদ্ধতিতে করা হবে সেই মতামতও টিক চিহ্নের মাধ্যমে জানানো এবং প্রয়োজনীয় মন্তব্য করার ঘর রাখা হয়েছে। ৫টি কমিশনের সুপারিশের স্প্রেডশিটে দেওয়া প্রস্তাবের কিছু বিষয়ের সাথে আমরা একমত, কিছু বিষয়ে সাথে আংশিক একমত এবং কিছু বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ দ্বিমত রয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি, রাষ্ট্রের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সংস্কার সম্পর্কে এই মতামতের উপর। তাই গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলোতে টিক চিহ্ন প্রদানের মাধ্যমে মতামত দিলে তা অসম্পূর্ণ হবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করবে। ফলে আমরা আমাদের পর্যালোচনা, সুপারিশ এবং আকাঙ্ক্ষার কথা কিছুটা লিখিত আকারে পেশ করছি এবং কিছুটা আপনাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করবো।

পাশাপাশি আর একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। বাংলাদেশের মানুষ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে বারবার। জনগণের আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচার বিদায় হলেও প্রতিবারই ব্যবস্থা বদল না হয়ে ক্ষমতার হাত বদল হওয়ার কারণে ক্ষমতাসীনদের মধ্যে দুর্নীতিবাজ ও স্বৈরাচারী হবার প্রবণতা গড়ে উঠে।

ফলে সংবিধান ফ্যাসিবাদ তৈরি করে একথা আমরা ঠিক মনে করি না। বরং সংবিধানে যতটুকু দায়বদ্ধতার কথা বলা আছে তা অস্বীকার করা এবং নিজেদের ইচ্ছামতো শাসন প্রশাসন চালাবার কারণে স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সামরিক অথবা বেসামরিক উভয় স্বৈরাচারের ক্ষেত্রেই এটা সত্য। আর ফ্যাসিবাদ কোন ব্যক্তি নয়, ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদী শোষণের ফল এবং

একটি আর্থসামাজিক ব্যবস্থার সৃষ্টি। শোষণমূলক আর্থসামাজিক ব্যবস্থায়ই ফ্যাসিবাদের পরিপূরক সামাজিক মননকাঠামোও গড়ে তোলে। এটা তো সত্যি, শুধু আইন কাউকে স্বেচ্ছাচারী করে না আর শুধুমাত্র আইন বদলালেই স্বেচ্ছাচারী হওয়া প্রতিরোধ করা যায় না, ব্যবস্থা বদল সাপেক্ষে জনগণের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধই কেবলমাত্র পারে স্বৈরাচারী প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করতে। ফলে স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক লড়াই অব্যাহত রাখা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অন্যতম রক্ষাকবচ। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আন্দোলনের স্বাধীনতা ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অগ্রসর করে নেয়া সম্ভব নয়।

এই লক্ষ্যে সংস্কার কমিশনসমূহ যে সমস্ত সুপারিশ দিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে গৃহীত পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক অধিকার বিকশিত করার পক্ষে সহায়ক হবে সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ

সংবিধান সংশোধন প্রসঙ্গে

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাবনা হলো, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা অর্থাৎ শোষণ-বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, '৯০-এর গণ অভ্যুত্থানের গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় এবং ২০২৪-এর গণ অভ্যুত্থানের মর্মবস্তুকে অর্থাৎ বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে এবং অবাধ সৃষ্ট, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রশ্নে প্রয়োজনীয় সংশোধনী করা উচিত। সংশোধন করার স্বার্থে অনুচ্ছেদ ৭ (ক) এবং ৭ (খ) বাতিল করার প্রস্তাবের সাথে আমরা একমত।

রাষ্ট্র এবং তার নাম

আমরা রাষ্ট্রের নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। অনেক নাম এবং শব্দ ব্যবহার করতে করতে তার একটি সাধারণ বোধগম্যতা তৈরি হয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ইতিহাস এবং আবেগ। ফলে, একে অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া কমিশনের প্রস্তাব হিসেবে জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি রাজনৈতিক ব্যাখ্যার জটিলতা তৈরি করবে বলে আমরা মনে করি।

রাষ্ট্রধর্ম এবং ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার

সংবিধান জনগণের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। এটি কোন অপরিবর্তনীয় বিধান নয় ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনস্বার্থে ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করা হবে জনগণের ইচ্ছায়। কিন্তু অতীতে সংবিধানের যতগুলো সংশোধনী হয়েছে তার দুই-একটা বাদে সবগুলোই শাসকদের দলীয় বা গোষ্ঠী স্বার্থে করা হয়েছে, জনস্বার্থে নয়। এর সঙ্গে ধর্মীয় আবেগ, সংবিধানের গুরুত্ব

বিসমিল্লাহ এবং রাষ্ট্র ধর্ম যুক্ত করার অর্থ মানুষের ধর্মীয় আবেগকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা। অতীতে সামরিক শাসনকে আড়াল করা, বৈধতা দেয়ার কাজে সংবিধানে ধর্মের ব্যবহার করা হয়েছে। পরাজিত ফ্যাসিবাদী শক্তিও সেটাকে দুঃশাসন আড়াল করার ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছে। তাই সকল জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিতে রাষ্ট্র যেন ধারণ করতে পারে, মর্যাদা দিতে পারে সংবিধানের এই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র রক্ষা করা দরকার। যেহেতু সংবিধান কোন ধর্মীয় দলিল নয় একটি পরিবর্তনযোগ্য দলিল তাই সংবিধানের গুরুত্ব 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এবং 'রাষ্ট্র ধর্ম হইবে ইসলাম' এই বিষয়দুটি বাদ দেয়ার দাবি জানাচ্ছি। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু এই বিবেচনায় নয় রাষ্ট্রের নাগরিকের মর্যাদা ও অধিকারের সুরক্ষা দেয়।

রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে

শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমাদের জনগণের লড়াই দীর্ঘদিনের। শোষণের সমাজ থেকে শোষণহীন সমাজে উপনীত হওয়ার মধ্যবর্তী ধাপ সমাজতন্ত্র। যেখানে স্বীকৃতি দেয়া হয় মানুষের মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্র দায়িত্ব নেয় জনগণের অনু-বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজের। নারীর স্বাধীনতা ও অধিকার, বেকারত্ব দূর করা এবং মানুষের আয় বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র এক অনন্য নজির স্থাপন করেছিল। সে কারণেই আমাদের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছিল। এমনকি ২০২৪-এর গণ অভ্যুত্থানেও অন্যতম আকাঙ্ক্ষা ছিল বৈষম্য দূর করা। বৈষম্যের উৎস যেহেতু পুঁজিবাদ, তাই সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াইয়ে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক হাতিয়ার। সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র বাদ দেয়া উচিত নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় অধিকার

রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র থাকবে কি না, এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামন্ত সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজে উত্তরণের সময়েই যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সেকুলার চিন্তার উদ্ভব ঘটে। ফলে আধুনিক গণতন্ত্রের ধারণা মানেই 'সেকুলার ডেমোক্রেসির ধারণা।' তাই ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া গণতন্ত্র কল্পনাযীত। প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্যানধারণাটি বাংলাদেশে পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকেই ছিল। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯১৮ সালে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ সম্মেলনে বলেছিলেন, হিন্দু জমিদার এবং মুসলমান জমিদার, হিন্দু মহাজন এবং মুসলমান মহাজনের শোষণ-নিপীড়নের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব দরিদ্র কৃষক একইভাবে শোষণ-নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। কাজেই মুসলমান কৃষকদের শোষণের বিষয়টি সাম্প্রদায়িক নয়, এর মূলে রয়েছে জমিদারি ও মহাজনি ব্যবস্থায়। এ জন্য হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে জমিদারি ও মহাজনি ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা উচিত।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট গণপরিষদের প্রথম সভায় তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, পাকিস্তান হবে এমন একটি রাষ্ট্র, যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক সমান অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, 'তোমরা স্বাধীন; তোমরা তোমাদের মন্দিরে যেতে স্বাধীন, এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে বাসদের মতামত

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

তোমাদের মসজিদে যেতে স্বাধীন অথবা পাকিস্তান রাষ্ট্রের যেকোনো উপাসনালয়ে যেতে স্বাধীন। তোমরা যেকোনো ধর্ম-বর্ণের হতে পারো, এটা রাষ্ট্রের কোনো বিষয় নয়। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে রাজনৈতিক বিবেচনায়, ধর্মীয় বিবেচনায় নয়।’ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সে ধারায় অবিচল থাকতে না পারা এবং তার মৃত্যুর পর পাকিস্তানের তৎকালীন নেতারা সে আদর্শ থেকে সরে আসেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মকে একীভূত করে ফেলেন।

রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কমিশনের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে এই বলে যে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা বাংলাদেশের বিদ্যমান বহুত্ববাদী সমাজের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং মূলত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাবিরোধী।’ বহুত্ববাদী একটি আধুনিক ধারণা, এটা বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে একেবারে নতুন এবং এর মর্মার্থ এখনো অনেকের কাছে বোধগম্য নয়। আমরা মনে করি ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদ পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক। ধর্মনিরপেক্ষতা সব ধর্মবিশ্বাসীকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস প্রতিপালনের নিশ্চয়তা প্রদান করে, যা প্রকারান্তরে সব ধর্মবিশ্বাসীর মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থান এবং বহুত্ববাদী সংস্কৃতির জন্য সহায়ক। আধুনিক রাষ্ট্রে তাই বিজ্ঞান মনস্কতাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি মানবিক মৌলিক অধিকার হিসেবেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে জাতীয়তাবাদী আবেগ এবং শক্তি তৈরি হয়েছিল তার স্বীকৃতি যেমন থাকবে তেমনি এই ভূখণ্ডে বসবাসরত সকল জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা নিশ্চিত করা উচিত। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্রের জন্যই এটা প্রয়োজন। আমরা মনে করি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের কথা বলা হয়েছে তা আমাদের প্রতিজ্ঞা এবং প্রত্যয় হিসেবে বিবেচিত। এটা রক্ষা করতে হবে। সংবিধানের শুরুতে অথবা শেষে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচারসহ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এনেস্ব হিসেবে সংযোজিত থাকা

দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার স্বপ্নে বিভোর অন্তর্বর্তী সরকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মনযোগ দেব। এখন যুদ্ধ খেলা তো বেধে গেছে, তাহলে কী করবেন? যদিও সরকারের পক্ষ থেকে এটাকে ব্যক্তিগত মন্তব্য হিসাবে প্রচার করা হয়েছে। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান তো হয়নি বরং নতুন অনুপ্রবেশ ঘটছে। ভারতের সাথে তিক্ততা কাটছে না, অন্যদিকে মার্কিন ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে। ছোট সাম্রাজ্যবাদের বদলে বড় সাম্রাজ্যবাদের কাঁধে ভর দিয়ে চলতে গেলে বিপদ যে বড় হয়ে দেখা দেবে না তার নিশ্চয়তা কী?

২০২৬-এ ভারতে নির্বাচন। বিজেপির ক্ষমতা নিরঙ্কুশ রাখা ও পশ্চিমবঙ্গ দখলের চিন্তায় মাথা ব্যাথা ও পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক কর্তৃত্ব বহাল রাখা ও অনিয়ন্ত্রিত ঘোলা পরিস্থিতি সামাল দিতে আরএসএস কিংবা লক্ষর-ই তইয়েবা দরকার, যুদ্ধ উন্মাদনা দরকার। আমেরিকার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনকে ঠেকিয়ে আসন পাতা ও সাগরের কর্তৃত্ব দরকার। জনগণকে উন্মাদনায় শামিল করা দরকার। যদিও এর খেসারত শেষ পর্যন্ত জনগণকেই দিতে হয়। অন্তর্বর্তী

উচিত। সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ এখনো প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বহাল রাখার উচিত মনে করি। কিন্তু জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে বাদ দেয়া এবং বহুত্ববাদকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করার কারণ এবং যুক্তি বোধগম্য নয়।

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা

জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ যদি শুধু ঘোষণায় থাকে এবং আইন দ্বারা সুরক্ষিত না হয় তাহলে জনগণের জীবনে তার প্রভাব পড়ে না। প্রাকৃতিক এবং জনগণের শ্রমে সৃষ্ট সম্পদের উপর জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব। পাশাপাশি চিন্তা, বিবেক, চলাচল, মতপ্রকাশ, সংগঠিত হওয়া, সমাবেশ করার স্বাধীনতা ছাড়া গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা যায় না। এক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশের কিছু বিষয়ের সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু উন্নয়ন, বিজ্ঞান, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা এবং কেন ও কীভাবে এগুলো মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হবে তা সুস্পষ্ট করা দরকার।

আইনসভা প্রসঙ্গে

কমিশনের পক্ষ থেকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার প্রস্তাব করা হয়েছে। আমরা মনে করি এতে জটিলতা আরও বাড়বে। আমরা এই প্রস্তাবের সাথে একমত নই। সংসদ সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্য জটিলতা (যেমন আসন সীমানা নির্ধারণ) নিয়ে আরও বিবেচনা করা দরকার। আইনসভার নির্বাচনে নারী সদস্যদের সংখ্যা ১০০ উন্নীত করে সরাসরি নির্বাচনের প্রস্তাবের সাথে আমরা একমত। মোট আসনের ১০ শতাংশ তরুণ তরুণীদের মনোনয়নের প্রস্তাব আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ভোটার ও প্রার্থীর বয়স কমিয়ে যথাক্রমে ১৭ ও ২১ বছর করার সিদ্ধান্ত এই সময়ে অপ্রয়োজনীয় এবং সন্দেহ উদ্রেককারী। এছাড়াও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য—অর্থবিল, জাতীয় নিরাপত্তা/ যুদ্ধ, অনাস্থা প্রস্তাব ছাড়া সকল ক্ষেত্রে ৭০ অনুচ্ছেদের কার্যকারিতা বাতিল করে সংশোধন করা।

রাষ্ট্রপতির মেয়াদ এবং অপসারণ পদ্ধতি পূর্বের মতোই বহাল রাখা

◆সংসদের মেয়াদ ৫ বছর রাখা। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ দুই বারের বেশি নয় এবং কর্তৃত্ব যুক্তিসঙ্গত করা। সংসদ নেতা, প্রধানমন্ত্রী, দলীয় প্রধান একই ব্যক্তি হবে কিনা সেটা স্ব স্ব দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ধারণের এখতিয়ার রাখা।

◆সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি পূর্বের মতোই বহাল রাখা। তবে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো/ ভিত্তি, মূলনীতি পরিবর্তন করা যাবে না এবং মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি কোন আইন সংসদের সকল সদস্য মিলে একমত হলেও করা যাবে না। প্রদেশ সৃষ্টি করার প্রস্তাব প্রয়োজনীয় নয় এবং রাষ্ট্রে আঞ্চলিকতার সংকট ও আস্থাহীনতা বাড়িয়ে তুলবে।

◆রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রয়োজন।

◆তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিধান প্রবর্তন করতে সংশোধনী আনা। মেয়াদ ৩ মাস ও পূর্বের পদ্ধতি বহাল রাখা।

◆কালোটাকা, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ, ঋণ খেলাপি, অর্থ পাচারকারী ও দুর্নীতিবাজদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করার বিধান কার্যকর করতে আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।

◆ভোটারদের সমর্থন প্রত্যাহার (Right to re-call) বিধান, পছন্দের প্রার্থী না থাকলে না ভোটের বিধান প্রবর্তন করা।

◆জামানত সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকায় সীমিত রাখা। নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা ৩ লাখের বেশি নয় এবং নিয়মিত তদারকি ও নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে নয়, সুয়োমটোর ভিত্তিতে কমিশনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান করা।

◆নির্বাচনকালীন সময়ে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা। তফসিল ঘোষণা থেকে শুরু করে ভোট গ্রহণ, ফল ও গ্যাজেট প্রকাশ পর্যন্ত নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত সকল সরকারি-আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে কমিশনের অধীনে নিয়োজিত থাকা এবং কেউ অপরাধ করলে কমিশনকে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া।

◆গণপরিষদ/ সংবিধান সংস্কারসভা/ জাতীয়

সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে আমাদের মত : এই মুহূর্তে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান জরুরি। নির্বাচিত সংসদই স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী সংস্কারসমূহ আলোচনা করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে পারবে।

◆স্থানীয় সরকার না জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে আমাদের মত-সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করা।

◆দুদক, পিএসসি, নির্বাচন কমিশন, মানবাধিকার কমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়োগসহ অন্যান্য বিষয়ে ইতিপূর্বে সংস্কার কমিশনে দেওয়া প্রস্তাবে আমাদের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। যার কপি এই সাথে সংযুক্ত করা হলো।

◆সংবিধানের প্রিয়েম্বল বা ভূমিকা পরিবর্তন করার প্রয়োজন নাই বলে মনে করি।

◆কমিশনের সুপারিশে পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে। ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ’২৪-এর গণঅভ্যুত্থানকে সমান্তরাল দেখানোর বা কোন ক্ষেত্রে ’৭১ কে ’২৪ দিয়ে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে বলে জনসাধারণের কাছে প্রতীয়মান হতে পারে।

◆২০২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের আকাক্ষা, আত্মত্যাগ, ফ্যাসিবাদ বিরোধী দীর্ঘ ১৫ বছরের সংগ্রাম ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংবিধানের শেষে এনেস্ব হিসেবে যুক্ত থাকতে পারে।

◆রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ইত্যাদি বিষয়সহ আরও অনেক বিষয় সরাসরি আলোচনার দাবি রাখে। বিচার বিভাগ, প্রশাসন, পুলিশ বিষয়ে সংস্কারের ক্ষেত্রেও আলোচনার বিষয় আছে। আমরা আশা করি সুযোগ পেলে আমরা আমাদের মতামতকে আরও সংহত ও কার্যকর প্রস্তাবনা হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবো।

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না।

সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে হবে

আমাদেরকে প্রস্তাব জমা আলোচনার জন্য সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। নানাবিধ জটিলতার কারণে আমাদের মতামত প্রদান করতে দেরি হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

জাতীয় বাজেটের ২৫% শিক্ষা খাতে বরাদ্দের দাবি

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

১১.৮৮%। অর্থাৎ এক দশকে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ১১-১২% এ ঘুরপাক খাচ্ছে। অপরদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন শিক্ষা বাজেট বাংলাদেশে। আমাদের পাশের দেশ শ্রীলঙ্কায় বামপন্থিদের জোট ক্ষমতায় এসে শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। জাতীয় আয়ের ৮.৬ শতাংশ বরাদ্দ করেছে শিক্ষাখাতে যা আমাদের দেশে ২ শতাংশেরও কম হয়। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় বাজেটের ২৫% বা জাতীয় আয়ের ৮% শিক্ষা খাতে বরাদ্দের দাবি জানিয়ে আসছে। এটি শুধু আমাদের দাবিই নয়, ইউনেস্কোও একই সুপারিশ করেছে। শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধ এবং শিক্ষা সংকোচন নীতি পরিহার করে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থাও অত্যন্ত নাজুক। শিক্ষা-গবেষণায় বরাদ্দ শূন্যের কোঠায়। নামে-বেনামে নানা খাতে ফি আরোপ করা হচ্ছে, কমছে শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রমাগতই নিম্নবিভূ-দরিদ্র মানুষের জন্য দুর্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। গভীর সংকটে আছে দেশের কলেজগুলো। সেখানে শিক্ষার ন্যূনতম আয়োজন নেই বললেই চলে। বেসরকারি স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে আর একই সাথে দুর্বল হচ্ছে সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষার মান ও আয়োজন। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় চলমান এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবারের বাজেটে বিশেষ উদ্যোগ ও পরিকল্পনা থাকবে বলেই ছাত্র সমাজ প্রত্যাশা করে।

বাসদ নেতা আল কাদেরী জয়, ছাত্রনেতা মিরাজউদ্দিন ও শ্রমিকনেতা রোকনের মুক্তির দাবি



বাসদ-এর বিবৃতি

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২৯ এপ্রিল '২৫ এক বিবৃতিতে চট্টগ্রাম জেলা বাসদ-এর ইনচার্জ ও রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান, ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের জেলা আহ্বায়ক আল-কাদেরী জয়, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি মিরাজ উদ্দিন ও রিকশা শ্রমিক রোকনকে গ্রেপ্তার ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়েরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছেন।

বাম গণতান্ত্রিক জোট

বাম গণতান্ত্রিক জোট কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সমন্বয়ক ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের

সাধারণ সম্পাদক কমরেড ইকবাল কবির জাহিদ, সিপিবি সভাপতি কমরেড শাহ আলম, সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশেরাফা মিশু, বাসদ মার্কসবাদীর সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা, সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি কমরেড আব্দুল আলী ২৯ এপ্রিল ২০২৫ সংবাদপত্রে দেওয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে চট্টগ্রাম জেলা বাম জোটের সমন্বয়ক ও বাসদ এর জেলা ইনচার্জ আল-কাদেরী জয়, ছাত্র ফ্রন্ট জেলা সভাপতি মিরাজ উদ্দিন, ব্যাটারি রিকশা, ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের নেতা রোকনকে নিবর্তনমূলক কালো আইন 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে গ্রেপ্তারকৃত নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, নিবর্তনমূলক

বিশেষ ক্ষমতা আইনটি ১৯৭৪ সালে প্রণয়ন করা হয়েছিল বিরোধী রাজনৈতিক দল ও মতকে দমন করার উদ্দেশ্যে। এই আইনে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই যে কোন ব্যক্তিকে বছরের পর বছর কারাগারে পুরে রাখা যায়। এই আইনে বিভিন্ন সময়ে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, লেখক, সাংবাদিক কারাভোগ করেছেন। বিরোধী দলে থাকলে সকলেই এই আইন বাতিলের দাবি করেন। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে কেউই এই কালোআইন বাতিল করেননি। বর্তমানের গণ অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারও অতীতের স্বৈরাচার ফ্যাসিস্ট সরকারগুলোর মতোই জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমনে কুখ্যাত কালো আইন ব্যবহার করেছে যা খুবই দুঃখজনক।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে ৫০ লাখের অধিক ব্যাটারি রিকশা, ইজিবাইক চালক ও তাদের পরিবারসহ প্রায় ৩ কোটির অধিক মানুষ এই ব্যাটারি চালিত যানবাহনের উপর নির্ভরশীল। দীর্ঘদিন ধরে ব্যাটারিচালিত রিকশা, ভ্যান, ইজিবাইকের আধুনিকায়ন করে নীতিমালা প্রণয়ন ও লাইসেন্স প্রদানের দাবি জানানোর পরও সরকার তা না করে অবৈধভাবে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষের জীবিকা হরণ করেছে। ব্যাটারিচালিত যানবাহনের অন্যান্য উচ্ছেদ ও জব্দ করা বন্ধের দাবিতে ২৯ এপ্রিল চট্টগ্রামের দেওয়ানহাটের মোড়ে সংগ্রাম পরিষদের পূর্ব ঘোষিত সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি চলাকালে চট্টগ্রাম জেলা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক, বাম জোট চট্টগ্রাম জেলা সমন্বয়ক ও বাসদ জেলা ইনচার্জ আল-কাদেরী জয়, ছাত্র ফ্রন্ট নেতা মিরাজ উদ্দিন, সংগ্রাম পরিষদ নেতা রোকনকে গ্রেপ্তার করে নিবর্তনমূলক কালোআইন 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' মামলা দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে আল-কাদেরী জয়, মিরাজ, রোকনের নিঃশর্ত মুক্তি, মিথ্যা

মামলা প্রত্যাহার এবং নীতিমালা প্রণয়ন করে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্স প্রদানের দাবি জানান।

বাসদের সমাবেশ ও মিছিল

বাসদ নেতা আল কাদেরী জয়, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি মিরাজ উদ্দিন ও ব্যাটারি রিকশা, ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের নেতা রোকনের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-এর উদ্যোগে ২৯ এপ্রিল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদ ঢাকা মহানগর ইনচার্জ নিখিল দাসের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদের কেন্দ্রীয় সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজকুজ্জামান রতন, বাসদ ঢাকা মহানগর নেতা আহসান হাবিব বুলবুল, খালেকুজ্জামান লিপন, রোখশানা আফরোজ আশা, নাসিরুদ্দিন প্রিন্স, জালাল মিয়া প্রমুখ।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিরাজ উদ্দিনসহ গ্রেপ্তারকৃত বাসদ নেতা আল-কাদেরী জয়, সেলিম মাহমুদ ও শ্রমিকনেতা রোকনের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ২ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি এলাকায় সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট।

গ্রেপ্তারকৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে বাসদ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ব্যাটারি রিকশা, ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই সব কর্মসূচি থেকে অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত গণ অভ্যুত্থান বার বার আসবে

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাসদের আলোচনা সভায়

কমরেড খালেকুজ্জামান

২৬ মার্চ '২৫ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সেগুনবাগিচাস্থ ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রাম বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় বিজয়; যার মধ্যদিয়ে স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, স্বাধীন নতুন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ হয়েছে, গণতন্ত্র ও অধিকারবোধের চেতনার বিজয় হয়েছে। '৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা অর্থনৈতিক শোষণ-সম্পদ লুণ্ঠন, রাজনৈতিক নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক আক্রমণ, সামাজিক অবমাননা ও বৈষম্যের শিকার হতে থাকে। সেখান থেকে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও ক্রোধের পাশাপাশি নতুন জাতি চেতনা ও মুক্তির আকৃতি সৃষ্টি হয়। মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা, সাংস্কৃতিক জীবনবোধ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন থেকে '৫২-র ভাষা আন্দোলন, শিক্ষার আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষক, ছাত্রদের আন্দোলন এবং '৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানসহ নানা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় সংঘটিত হয় স্বাধীনতা



সংগ্রাম। ৯ মাসব্যাপী লড়াইয়ে মানুষের সীমাহীন জীবনদান, ২ লাখ মা-বোনের লড়াই, আত্মত্যাগ ও অঙ্গহানির মধ্যদিয়ে দেশ স্বাধীন হয়। বিশাল এই ত্যাগের সাথে অন্য কিছুর তুলনাই চলে না। গত ৫৪ বছরে শাসকশ্রেণি এর যথার্থ মূল্যায়ন করা এবং তদানুযায়ী দেশ শাসন করার যোগ্যতা অর্জন করেনি। কারণ মুক্তিযুদ্ধে জনগণের শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দাঁড়িয়ে তারা সবাই পুঁজিবাদের পথে দেশ পরিচালনা করেছে।

তিনি আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ, যা বাংলাদেশের ভিত্তি। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধকে বাণিজ্যিক পণ্য এবং ক্ষমতার স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছে। আজও সে ধারা অব্যাহত আছে।

তিনি বলেন, সংবিধানের চার মূলনীতির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র বাতিলের প্রস্তাব আসছে, যা উদ্দেশ্য গোপন রেখে নব প্রতারণার শামিল।

কমরেড খালেকুজ্জামান তার বক্তব্যে বলেন, গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান হলেও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ হয়নি। ফলে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যভ্রষ্ট পথহারা জাতি এখন নতুন বিভ্রান্তির ধাঁধায় পড়েছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সাম্য, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের চেতনা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত '৯০ ও '২৪-এর মতো গণ অভ্যুত্থান বার বার ঘটবে। সমাজতন্ত্রই পথের প্রকৃত দিশা জোগাবে এর কোনো বিকল্প নেই।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বর্তমান

সরকারের সমালোচনা করে বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার গণ অভ্যুত্থানের চেতনার বিপরীতে চলছে। চাল-তেলসহ নিত্যপণ্যের বাজার সিঁড়িকেটের দখলে, ট্রাক সেলের লাইন নিলুআয়ের মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। শ্রমিক আন্দোলন দমন-পীড়ন ফ্যাসিবাদী শাসনেরই ইঙ্গিত দেয়।

তিনি দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন, মাজার ধ্বংস, নারী নির্যাতন, মব লিঙ্কিংয়ে আতঙ্কিত জনগণ। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে অবিলম্বে সুনির্দিষ্ট নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের এ ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই, যা জনমনে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেছে। অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার গঠন সময়ে দাবি।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়ন না হলে বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র ও সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে না। সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা, অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার ইনচার্জ নিখিল দাসের সভাপতিত্বে এ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড খালেকুজ্জামান, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ এবং ঢাকা মহানগর সদস্য খালেকুজ্জামান লিপন।

নারীর ডাকে মৈত্রী যাত্রার সমাবেশ ও মিছিল



নারী বিদ্বেষ, নারীর প্রতি সহিংসতা ও অবমাননা বন্ধ, নারীর বিরুদ্ধে কুৎসা-অপপ্রচার, গুজব ছড়ানো এবং আজম্ব সৃষ্টির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ

বিভিন্ন দাবিতে ঢাকা মানিক মিয়া অ্যাডমিনিস্ট্রেট ১৬ মে অনুষ্ঠিত হয় 'নারীর ডাকে মৈত্রী যাত্রা'।

রাখাইনে করিডোর দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকিতে পড়বে

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২৯ এপ্রিল '২৫ গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে কতিপয় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনা না করে একতরফাভাবে অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে রাখাইনে মানবিক করিডোর দেওয়ার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জানিয়েছেন।

কমরেড ফিরোজ বলেন, আন্তঃদেশীয় মানবিক করিডোরের মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে কোন রকম আলোচনা ও সম্মতি ছাড়া অনিবার্চিত অন্তর্বর্তী

সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ জাতিকে নিয়ে পাশা খেলার শামিল। বিবৃতিতে তিনি বলেন, কোন শর্তে করিডোর? রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে কী মনোভাব? আরাকান আর্মির সাথে এ বিষয়ে কোন যোগাযোগ হয়েছে কি না? মায়ানমার সরকার বিষয়টি কীভাবে দেখবে? তাদের সাথে সরকারি পর্যায়ে কোন আলোচনা হয়েছে কি না? চীন এটাকে কীভাবে নিবে এসব বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা জাতির সামনে পরিষ্কার করা উচিত।

কমরেড ফিরোজ বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার যেমন সাম্রাজ্যবাদী ভারতের স্বার্থে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছিল। ড. ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারও কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে রাখাইনে মানবিক করিডোর দিয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তাকে হুমকিতে ফেলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ক্রীড়নক হিসেবে

বাসদের উদ্যোগে ব্রহ্মপুত্র কনভেনশন অনুষ্ঠিত



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কুড়িগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে ১৭ মে জেলা আইনজীবী সমিতি ভবনের এটিএম এনামুল হক চৌধুরী চাঁদ মিয়া মিলনায়তনে ব্রহ্মপুত্র নদী নিয়ে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বাসদ আহ্বায়ক কমরেড ফুলবর রহমানের সভাপতিত্বে কনভেনশনে

বক্তব্য দেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজকুজ্জামান রতন, নদী গবেষক শেখ রোকন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক সিরাজাম মুনির, বাসদ রংপুর জেলা আহ্বায়ক কমরেড আব্দুল কুদ্দুস ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

তথাকথিত মানবিক করিডোর, নিউমুরিং টার্মিনাল ইজারা ও সামরিক যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা স্থাপনের চক্রান্ত রুখে

মিয়ানমারের রাখাইনে মানবিক করিডোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল, চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার ঘোষণা এবং সমরাস্ত্রের যন্ত্রাংশ তৈরির খাতে বিনিয়োগ করতে সরকারের আহ্বানের প্রতিবাদে বাম

গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ১৫ মে ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল হয়।

সমাবেশে বাম জোটের নেতারা বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪



বাংলাদেশকে গাজা বা ইউক্রেন বানাতে চাইছে? তিনি বলেন, বিবিসি'র ভাষ্য মতে 'যুদ্ধ চলমান যে সব জায়গায় মানবিক করিডোর করা হয়েছে, সেগুলোকে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র মানবিক করিডোরে সীমাবদ্ধ রাখা যায়নি, বরং এর সঙ্গে সামরিক নানা বিষয় যুক্ত হয়ে পড়েছে।'

বিবৃতিতে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন আধিপত্য বজায় রাখতে চীনকে ঠেকানোর জন্য আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরেই বঙ্গোপসাগরের উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে মরিয় হওয়ার খবর দেশি বিদেশি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে আসছে। মায়ানমারের রাখাইন রাজ্য, বাংলাদেশের বান্দরবানসহ পার্বত্য অঞ্চল ও ভারতের মনিপুর, মিজোরামকে নিয়ে স্বাধীন একটি রাষ্ট্র গঠনের মার্কিন অভিলাষের কথা সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী জামায়াতে ইসলামীও গত ২৭ এপ্রিল

'২৫ বাংলাদেশে সফররত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাতে 'আরাকানে স্বাধীন রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছে। সেই মুহুর্তে গোটা জাতিকে অন্ধকারে রেখে বাংলাদেশ সরকারের এই কথিত মানবিক করিডোর প্রদানের সিদ্ধান্ত মার্কিন এজেন্ডারই অংশ বলে দেশবাসী মনে করে।

বিবৃতিতে তিনি কথিত মানবিক করিডোর প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে রাজনৈতিক দলসমূহের মতামত গ্রহণের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান। একই সাথে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার যুদ্ধ চক্রান্তে জড়ানোর অনিবার্চিত অন্তর্বর্তী সরকারের গণবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকল বাম প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ খেলা : কার লাভ কার ক্ষতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

৪০ জন সেনা সদস্যের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ও ছোটখাট যুদ্ধে জড়িয়ে পরে দুই দেশ। পরবর্তিতে যুদ্ধ শেষ হয়েছে কিন্তু পারস্পরিক সন্দেহ অবিশ্বাসকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। ফলে মাঝে মাঝেই উত্তেজনার পারদ উঠানামা করতে থাকে।

এবারে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনার গুরু ২২ এপ্রিল। সে দিন ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের উপর বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহত হন। ঘটনার পর পরই এই নৃশংস হামলার দায় পাকিস্তানের ওপর চাপিয়েছে ভারত। পাকিস্তান এই অভিযোগ নাকচ করে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করে। এ নিয়ে পালটাপালটি বক্তব্য আর উত্তেজনার মধ্যে ৬ মে রাতে পাকিস্তান ও দেশটির নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের নয়টি স্থানে ‘অপারেশন সিঁদূর’ নামে হামলা চালায় ভারত। হামলার আগে থেকেই নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল ভারত। ফলে এটা অনুমান করা যাচ্ছিল যে ভারত সামরিক পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। ফলে পাকিস্তান সতর্ক ছিল এবং সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনার পাশাপাশি ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলায় মদদ দেওয়ার অভিযোগ এনে ১৯৬২ সালে স্বাক্ষরিত সিন্ধু পানিচুক্তি স্থগিত করে। পরস্পরের প্রতি প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে দুই দেশই সীমান্ত বন্ধ করার পাশাপাশি নিজ নিজ আকাশসীমায় প্রতিপক্ষের বিমান চলাচল বন্ধ করে

দেয়। এ ছাড়া পরস্পর ভিসা বাতিল, আকাশসীমা বন্ধ, বন্দর ব্যবহার বন্ধসহ নানা ব্যবস্থা নেয় দুই দেশ। শুধু সামরিক নয় দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে দুই দেশের শেয়ারবাজারেও।

প্রভাব পড়েছে বেসামরিক বিমান চলাচলেও। পাল্টাপাল্টি হামলার কারণে পাকিস্তানের করাচি, লাহোর ও ইসলামাবাদের বিমানবন্দরগুলোর কার্যক্রম সাময়িক স্থগিত করা হয়। ১০ মে পর্যন্ত ভারতের ২০টির বেশি বিমানবন্দরের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। এই বিমানবন্দরগুলোর বেশির ভাগই উত্তর ভারতে। এইসব পদক্ষেপের কারণে ভারতের ৪০০টির বেশি ফ্লাইট বাতিল করা হয়।

যুদ্ধের শুরুতেই আকস্মিক ও তীব্র আক্রমণ চালায় ভারত। ৬ মে ভারত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জায়গায় বিমান হামলা চালায়। ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি বলেছেন, সন্ত্রাসীদের ৯টি ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। আর রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের ৩টি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তান দাবি করেছে তারা ৫টি বিমান ভূপাতিত করেছে। ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের সামরিক বা বেসামরিক স্থাপনায় হামলার কথা অস্বীকার করা হলেও একটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে পাকিস্তান দাবি করেছে। ভারতের হামলার পরপরই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বলা হয়েছে, ভারতের হামলার জবাবে নিজস্ব সময়, স্থান ও পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়া জানানোর অধিকার তাদের আছে। পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী

ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। পাকিস্তানের পার্লামেন্টের বাইরে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, পাকিস্তানে হামলায় ভারতের ৭৫ থেকে ৮০টি যুদ্ধবিমান অংশ নিয়েছিল। ভারতের হামলার মুখে সংযত আচরণ করেছে পাকিস্তান। হামলায় অংশ নেওয়া ‘প্রায় ৭৫ থেকে ৮০টি বিমানের’ মধ্যে মাত্র পাঁচটিকে তারা গুলি করে ভূপাতিত করেছে।

আর ভারতীয় সেনাবাহিনীর দাবি করেছে, তারা এসব হামলা চালিয়ে সশস্ত্র গোষ্ঠী লস্কর-ই-তায়েবা (এলইটি) ও জইশ-ই-মোহাম্মদের (জেইএম) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা বলেছে, পাঞ্জাবের ভাওয়ালপুরে জেইএমের ঘাঁটি এবং একই প্রদেশের মুরিদকে শহরে এলইটি’র আন্তানাসহ নয়টি স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে তারা।

অবশ্য পাকিস্তানের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, পাকিস্তানের ছয় স্থান-পাঞ্জাবের শিয়ালকোট, ভাওয়ালপুর ও মুরিদকে এবং পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের রাজধানী মুজাফ্ফারাবাদ, বাগ ও কোটলিতে ছয়টি জায়গায় ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, হামলায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় আঘাত হানতে সক্ষম সমরাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। তাৎক্ষণিক গোয়েন্দা তথ্য নিয়ে ভারতের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী সম্মিলিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে। এমনভাবে হামলাগুলো চালানো হয়েছে যেন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কোনো স্থাপনা লক্ষ্যবস্তু না হয়। হামলায় স্কাল্ল ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, হ্যামার

রানা প্লাজা ধসের একযুগ : শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত হয়েছে কি?

১৩ পৃষ্ঠার পর

নয় শোষণমুক্তির লক্ষ্যে রাজনীতি সচেতন ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, রানা প্লাজার ধসের এক যুগ পার হয়েছে—এ সময়ে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে? বাস্তবে তেমন অগ্রগতি দেখছি না। হিসাবে দেখা যাচ্ছে, রানা প্লাজা ধসের ১২ বছর আগে দুর্ঘটনায় যে পরিমাণ শ্রমিক নিহত হয়েছে, পরের ১২ বছরে নিহত তার চেয়ে কমেনি। প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা সাধারণ চিত্র হচ্ছে গেটে তালা দিয়ে রাখা। সবগুলো দুর্ঘটনার পর লাশ পাওয়া গিয়েছে কারখানার সিঁড়ির গোড়ায় গেটের সামনে। শ্রমিকদের জীবনের প্রতি মালিকদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে অবজ্ঞা ও উপেক্ষার। কারণ, শ্রমিক মারাগেলে মালিক এবং শ্রম খাতের সরকারি কর্মকর্তাদের কিছু যায়-আসে না। এর জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হয় না, ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না, আর দিলেও তা নামমাত্র। আর একটা বিষয় আমরা খেয়াল করেছি রাজনৈতিক দলগুলো শ্রমিকদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যায় না। আমরা মনেকরি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা জানানো উচিত, শ্রমিকদের পক্ষে দাবি জানানো দরকার। হাসেম গ্রুপে দেখা গেছে মা সন্তানের লাশ সনাক্ত করতে পারেনি, ডিএনএ পরীক্ষা করতে হয়েছে। বিষয়টা কতটা মর্মান্তিক, সমাজটা কি নীরব থাকবে? বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম হচ্ছে নির্মাণ খাত, অথচ এখাতে একজনও শ্রমিক নেই। সকল শ্রমিক হচ্ছে ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত। রাষ্ট্র এবং মালিকরা কতটা নির্মম ও নির্লিপ্ত তা আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি। আমরা কেউ-ই এখানে নিরাপদ নই। আমাদের বৃহত্তর কনভেনশন করে দাবিদাওয়াগুলো ঠিক করতে হবে। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে।

এম. এম. আকাশ বলেন, প্রত্যেকের কিছু অধিকার বুঝে নেওয়ার আছে দায়িত্ব আছে। অর্থাৎ অধিকার আদায়ের আন্দোলনটা দুর্বল

হওয়ার কারণে অধিকার পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা যাদের বিরুদ্ধে লড়াছি তারা হলো—শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান পুঁজিপতি শ্রেণি। এদের তিনটা বাহু। প্রথমত, অসৎ আমলা, দ্বিতীয়ত, অসৎ-লোভী ব্যবসায়ী, তৃতীয়ত, স্বার্থপর রাজনীতিবিদ।

শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী মজুরি দিতে হবে। কিন্তু শ্রমিকরা সংখ্যায় বেশি, মালিক সংখ্যায় কম, তাই মালিকরা কম মজুরি দিয়েও শ্রমিক পায়। শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা দিতে হবে, সেটা মালিকের স্বার্থেই। না হলে সে কাজের জন্য মজুর পাবে কোথায়? শ্রমিকের সন্তান আগামী দিনের মজুর, সে মজুরও মালিকের লাগবে। এখন মজুর বেতন-ট্রেড ইউনিয়ন দাবি করলে তাকে গুলি খেতে হয়, জেলে যেতে হয়। আমরা ক্ষতিপূরণের একটা মানদণ্ড নির্ধারণ করেছি। শ্রমজীবী মানুষের প্রাণের দাম মালিকদের কাছে খুবই কম। শ্রমিকদের অধিকার কেউ দিবে না, সেটা তাদের আদায় করে নিতে হবে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা হচ্ছে ইচ্ছাকৃত দায়িত্ব অবহেলার কারণে। সবাই প্রত্যাশা করেছিল এই দুর্ঘটনার পর শ্রমিকের নিরাপত্তা উন্নত হবে। কিন্তু হয়নি। যা হয়েছে সেটা হলো পর্বতের ইঁদুর প্রসব। ২০০৮ থেকে ’১৯ পর্যন্ত ৮০টি ক্ষতিপূরণ মামলা লেবার কোর্টে ওঠেছে, তার মধ্যে ৩৫টার ক্ষতিপূরণের রায় দিয়েছে। ১৯টা আদায় হওয়া সম্ভব হয়েছে। একটা মামলা ৬০ দিনের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা কিন্তু শেষ হতে সময় লেগেছে গড়ে ২১ মাস। তার মানে আমাদের সমাজে কোন ন্যায্যতা নেই।

ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধ্বংসের পর, এই প্রথম সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত (সুয়োমোটো) হয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদেশ দেয়। যেমন, রানা প্লাজা ধসের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা; নিহত ও আহত শ্রমিকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসা ব্যয় প্রদান; ধসে আটকা পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার ও চিকিৎসা করা; সারা দেশে অনিরাপদ ভবন চিহ্নিত করে তা ধ্বংস বা সংস্কার করার; শ্রমিকদের সুরক্ষা দেওয়া; দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল

গঠন; সোহেল রানা ও তার পরিবারকে যেখানেই পাওয়া যায়, তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তার করা। শিল্প দুর্ঘটনায় আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণের আদেশ দেয়া এবং ক্ষতির মানদণ্ড নির্ধারণের আদেশ দেয়। এর প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য একটা কমিটিও করা হয়। নিরাপদ কর্মক্ষেত্র আইন ২০১৮ প্রণয়নে এই রায় ভূমিকা রাখে। শুধু অপরাধীর সাজার কথা বললেই হবে না একই সাথে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার ক্ষতিপূরণের দাবিটাও করতে হবে। রানা প্লাজা মামলার ফাইল কোর্ট থেকে কোর্টে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কেউ ফাইল খুলতে চায় না। ফাইল খুললে আমরা অনেক কিছু দেখানে পেয়ে যাব। একযুগ পার হয়ে গেলেও এই মামলার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোন আইনজীবী নিয়োগ করা হয়নি। এই সব বিষয়ে সবাইকে দাবি তুলতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র/ইউরোপীয় ইউনিয়ন ‘ফরেন টর্ট ক্লেইমস অ্যাক্ট (ATS)’ বা ইইউ ‘ডিউ ডিলিজেন্স’ আইনে বিদেশি ব্র‍্য‍া‍ন্ডগুলো সরবরাহকারী কারখানার নিরাপত্তার জন্য পরোক্ষ দায়বদ্ধ। কিন্তু বাংলাদেশে বিদেশি ব্র‍্য‍া‍ন্ডের বিরুদ্ধে মামলা করার কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নেই। এটা নিয়ে কিছু চেষ্টা করা হয়েছিল। আবার বাংলাদেশি কিছু আইনজীবী বিদেশে গিয়ে বলেছে রানা প্লাজার ব্যাপারে যা যা হয়েছে এখন আর কিছু করার নেই।

আনোয়ার হোসেন বলেন, আজকের রানা প্লাজা ধসের দিনে এই কনভেনশন আয়োজনের জন্য শ্রমিক ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের দেশে যদি শ্রম আইন ও আইএলও কনভেনশন যথাযথ কার্যকর হতো তা হলে এভাবে শ্রমিক মারা যেত না। মালিকরা শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্য উদাসীন থাকতে পারতো না। শ্রমিকরা ইউনিয়ন করতে পারলে কারখানার ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারতো। আমাদের দেশের মালিকদের কাছে শ্রমিকদের জীবনের কোন মূল্য নাই। আমাদের শ্রমিকদের এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

প্রিসিশন-গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র এবং আত্মঘাতী ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে।

এতো গেল যুদ্ধের বিবরণ। যুদ্ধ করে সেনাবাহিনী, গুরু করে ক্ষমতাসীনরা আর যুদ্ধের খরচ যোগায়, ক্ষয়ক্ষতি বহন করে জনগণ। তাই যুদ্ধ নিয়ে উন্মাদনা তৈরি না করলে জনগণের আবেগকে ব্যবহার করা যায় না। এই উন্মাদনায় জাতিগত, ধর্মীয় সকল উপাদান ব্যবহার করে জনগণকে উত্তেজিত করা হয়। ফলে অস্ত্র ব্যবসা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষের দাবিকে পাশে সরিয়ে রাখা এবং রাজনৈতিক ফায়দা তোলা সবই সম্ভব হয়। আর দিনশেষে জনগণ দেখে যুদ্ধে জয়পরাজয় নিয়ে যত বিতর্ক থাকুক না কেন আসলে হেরে গেছেন তাঁরা। এবারও পারমাণবিক শক্তির দুই প্রতিবেশীর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে এ অঞ্চলে পড়তে শুরু করেছে। এক দেশের আকাশসীমা ব্যবহার করে অপর দেশের বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রী ও পরিবহন খরচ বেড়েছে। দুই দেশের শেয়ারবাজারে ধস নেমেছে। ভারতীয় মুদ্রা রুপির দামও কমেছে। এমনকি যুদ্ধের কোন পক্ষ না হওয়ার পরও শেয়ারবাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে গত ৭৮ বছরে কয়েক দফা যুদ্ধ হলো। কে লাভবান হয়েছে? প্রতিটি যুদ্ধেই শেষ পর্যন্ত সমাধান খুঁজতে হয়েছে আলোচনার টেবিলে। ১৯৭২ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সিমলা চুক্তিতে ভারত পাকিস্তান লাইন অব কন্ট্রোল বা এলওসি মেনে **এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১**

চৌধুরী আশিকুল আলম বলেন, আমাদের দাবি উত্থাপন করতে হবে এবং তা আদায়ের জন্য লড়াই করতে হবে। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের একটা স্থায়ী কাঠামো তৈরি না করলে তারা অধিকার বঞ্চিত হবে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত লাগবে।

বাদল খান বলেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মার্কেট ইকনোমি, গ্লোবলাইজেশন, মুক্ত বাজারের নামে লুটেরা ব্যবস্থা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। আমাদের এগুলো রাজনৈতিক দর্শন দিয়ে বিচার করতে হবে। উন্নয়ন সহযোগী নামে যে শক্তির কথা বলা হচ্ছে তারা শ্রমিকের উন্নয়ন করেনি, নিজেদের উন্নয়ন করেছে। তারা শ্রমিক ঐক্য ট্রেড ইউনিয়ন দুর্বল করার জন্য ভাঙার জন্য তৎপরতা চালাচ্ছে। এরা শ্রমিকের জীবন বুঝে না মুনাফা বুঝে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ফ্যাক্টরি ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন (DIEF), বাংলাদেশ শ্রম অধিদপ্তর যদি শ্রমিকের জীবনে নিরাপত্তায় কোনো ভূমিকা না রাখতে পারে আমরা কেন তাদের বেতন দিয়ে রাখব? আমাদের প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, কর্মপরিবেশের সুরক্ষা শুধু আইন বা নিয়মের বিষয় নয়, এটি মানবিক দায়িত্ব। বিপজ্জনক, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করলে শ্রমিকসহ প্রতিটি মানুষের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয় কিন্তু মুনাফা প্রধান হলে কোনো কিছু কাজ করে না।

সিকান্দার আলী মিনা বলেন, প্রতিটি জায়গায় কাজের ঝুঁকি থাকে। যে সঠিক প্রক্রিয়া অবলম্বল করে কাজটা করার দরকার তা করা না হলে দুর্ঘটনা ঘটে। নিয়ম না মানাই আমাদের মানসিকতা। সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। যে কোনো কাজ করার শুরুতে প্রশিক্ষণ দিতে হয়, বাংলাদেশে কোথাও তা করা হয় না। ভবন নির্মাণের ক্রটি, কাজের অদক্ষতা-অবহেলা, অতি মুনাফার লোভ রানা প্লাজা ধসের কারণ।

মেহনতের মর্যাদা, শোষণের অবসান মে দিবসে হোক শপথ পুনর্বার!



গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য

মহান মে দিবস উপলক্ষে ১ মে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের আয়োজনে ঢাকা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক আয়োজন অনুষ্ঠিত।

‘গানে গানে আজ সকল শেকল ভাঙ্গি নতুন স্বপ্ন বুন’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য একটি সাংস্কৃতিক সমাবেশের আয়োজন করেছে। সমাবেশের সভাপতিত্ব করেছে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের আহ্বায়ক মফিজুর রহমান লালটু এবং সঞ্চালনা করেছে বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাংগঠনিক সম্পাদক আমীরুন নূজহাত মণীষা। সমাবেশটি দুই ধাপে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম ধাপে আলোচনা এবং দ্বিতীয় ধাপে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। আলোচনা সভায় বক্তব্য রেখেছেন রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক ইউনিয়নের

সভাপতি আবদুল কুদ্দুস, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতি নিখিল দাস, উদীচীর সাধারণ সম্পাদক জামশেদ আনোয়ার তপন, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড. হারুন-উর রশীদ, সমাজ চিন্তা ফোরামের আহ্বায়ক কামাল হোসেন বাদল, গণসংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি কামাল হোসেন বাদল এবং প্রগতি লেখক সংঘের কোষাধ্যক্ষ দীনবন্ধু দাস।

সাংস্কৃতিক সমাবেশে সংগীত পরিবেশনা করে বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও উদীচী। একক গান পরিবেশনা করে উর্মি, সুরাইয়া পারভীন, ভাষা ও হুমায়রা তাহসিন। কবিতা আবৃত্তি করেন কবি হাসান ফকরী, সমাজ চিন্তা ফোরাম ও রবিউল ইসলাম শশী। মুকাতিনয় পরিবেশনা করেন নিখর মাহবুব। চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নাটক পরিবেশনা করে।

৫০ লক্ষ টন বোরো ধান ক্রয়ের দাবিতে

কৃষক-ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের বিক্ষোভ

◆ প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টন বোরো ধান ক্রয় করা ◆ ভূমিহীনসহ প্রকৃত কৃষকের জন্য কৃষি কার্ড বিতরণ ◆ ধানসহ সব ফসলের লাভজনক দাম নিশ্চিত করা ◆ সিডিকেট ভেঙে কৃষক সমবায়ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা ◆ পল্লী রেশন ও শস্য বিমা চালু করা ◆ চাঁদপুর সেচ প্রকল্পে (সিআইপি) সেচ সংকট ও জলাবদ্ধতা দূর করার দাবিতে ২৬ এপ্রিল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কৃষক-ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সমন্বয়ক ও কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহির চন্দনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষক সমিতির সভাপতি অ্যাড. এস এম এ সবুর, জাতীয় কৃষক ও ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের সভাপতি বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি ডা. ফজলুর রহমান, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল্লাহ মুসা, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন দুলাল, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা রাজু আহমেদ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, এবছর বোরো ধানের উৎপাদন খরচ বেড়েছে, কিন্তু সরকার কেজিপ্রতি মাত্র ৪ টাকা বৃদ্ধি করে ধানের দাম নির্ধারণ করেছে ৩৬ টাকা আর ১৪ লক্ষ টন সেদ্ধ চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ৪৯ টাকা/কেজি দরে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গত বছর ৬ লাখ টন ধান ক্রয়ের লক্ষ্য ছিল; এবার তা কমিয়ে সাড়ে ৩ লাখ টন করা হয়েছে যা কৃষকদের সাথে প্রহসন। সরকার চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়েছে এতে লাভবান হবে চাটাল মালিক ও সিডিকেট ব্যবসায়ীরা। কারণ কৃষক ধান উৎপাদন করে, আর চাটাল মালিক ধান প্রক্রিয়া করে চাল তৈরি করে। দাবিসমূহ:

১. কৃষি সংস্কার কমিশন গঠন করে কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন ও বাজার ব্যবস্থার সংস্কার কর
২. ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্রয় কেন্দ্র চালু করে সরাসরি কৃষক থেকে ধান সংগ্রহ করতে হবে
৩. সার, বীজ, সেচের দাম কমাতে হবে, এবং কৃষককে ভর্তুকি দিতে হবে
৪. ভারতের মডেলে চাটাল কলের গুদামে ধান সংরক্ষণ ও বাজার নিয়ন্ত্রণ
৫. জমি সংস্কার ও কৃষি ঋণ সহজীকরণ করতে হবে



ফিলিস্তিনিদের ওপর দখলদার ইসরায়েলি নারকীয় আত্মসন ও গণহত্যার প্রতিবাদ

ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে সংহতি কমিটির সমাবেশ

ফিলিস্তিনিদের ওপর দখলদার ইসরায়েলি নারকীয় আত্মসন ও গণহত্যার প্রতিবাদ জানাতে ১৯ এপ্রিল রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফিলিস্তিন সংহতি কমিটি, বাংলাদেশ-এর গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ইমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বক্তব্য রাখেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, ও ডা. হারুন অর রশীদ। উপস্থিত ছিলেন, সিপিবি সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম, বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজসহ বাম গণতান্ত্রিক জোট ও ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চার নেতারা।

সমাবেশের শুরুতে বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শিল্পীরা প্রতিবাদী নাটিকা পরিবেশন করেন।

সমাবেশে ফিলিস্তিন সংহতি কমিটি, বাংলাদেশ এর পাঁচ দফা দাবি পাঠ করা হয়।

দাবিগুলো হলো:

◆ ফিলিস্তিনিদের উপর দখলদার ইসরায়েলি নারকীয় আত্মসন ও গণহত্যা অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

◆ ইসরায়েলি দখলদারিত্ব ও নিয়ন্ত্রণের পরিপূর্ণ অবসান ঘটিয়ে ফিলিস্তিনের উভয় অংশের মানুষের জানমাল, জীবন-জীবিকা, নিরাপত্তা, পরিপূর্ণ মানবাধিকার এবং মর্যাদা



রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

◆ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন চুক্তি, প্রস্তাব ও শর্ত/মানদণ্ড অনুযায়ী স্বাধীন ও সার্বভৌম প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে।

◆ অবিলম্বে ইসরায়েলের সঙ্গে বাংলাদেশের গোপন ও পরোক্ষ সব সম্পর্ক ও লেনদেন ছেদ করার স্বেচ্ছা ব্যবস্থা নিতে হবে। ফিলিস্তিনি জনগণের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে বাংলাদেশকে ইসলামি সম্মেলন সংস্থা ও জাতিসংঘে দৃঢ় ও স্বেচ্ছা ভূমিকা নিতে হবে।

◆ ফিলিস্তিনি মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে সারা বিশ্বে ইসরায়েলি পণ্য বর্জন করে অর্থনৈতিক চাপ তৈরির বৈশ্বিক আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে পণ্য বর্জনের আন্দোলনের অজুহাতে উচ্চজ্বল দাঙ্গাবাজরা দেশের বিভিন্ন স্থানে দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুটপাট করে এই আন্দোলন এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে কলুষিত করেছে; সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ ও শ্রমিকদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এমন ঘটনার জন্য দায়ী সকলের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রদান করতে হবে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা জানি যে, ইসরায়েলের নৃশংস বর্বরতা অবর্ণনীয় তাগবে রূপ নিয়েছে। এর পেছনে আছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা এবং নেতৃ

স্থানীয় আরব ও মুসলিম দেশগুলোর লজ্জাজনক নীরবতা। সে কারণে দেশে দেশে সক্রিয় প্রতিবাদ জানানো আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই ফিলিস্তিনের ন্যায়সংগত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানাতে এবং মানবাধিকারবিরোধী অপরাধের প্রতিবাদে দলমত, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতি ও বয়স নির্বিশেষে আজকের এ সমাবেশে এসেছি আমরা।

ফিলিস্তিনে মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিশ্বের নানা দেশে ফিলিস্তিনি নাগরিকদের জন্য যে সংহতি সমাবেশ হচ্ছে সেটি বিশ্বে সবচাইতে আশাব্যঞ্জক ঘটনা।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, একদিকে যেমন অনেক মুসলিম প্রধান দেশ ফিলিস্তিনিদের পাশে সক্রিয়ভাবে না দাঁড়িয়ে বরং ইসরায়েলকে সহায়তা করছে, তার বিপরীতে আবার বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টান-ইহুদিসহ বিভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বী মানুষেরা ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ইসরায়েলি দখলদারিত্বের প্রতিবাদ করছেন অত্যন্ত জোরালো পন্থায়। এমন ঘটনাগুলো এটাই স্পষ্ট করে যে, ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ইসরায়েলি জুলুম, গণহত্যা, দখলদারিত্ব আর তার বিরুদ্ধে লড়াই ইহুদি-মুসলিম ধর্মীয় বিরোধের বিষয় নয়। এ লড়াই সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী দখলদার জালেম অপশক্তির বিরুদ্ধে সব ধর্ম-বর্ণের মুক্তিকামী মজলুম বিশ্ব মানবতার লড়াই। বিশ্বব্যাপী এ লড়াই জোরদার করতে হবে।

শ্রীলঙ্কায় বামপন্থি সরকারের নতুন বাজেট কেমন হলো?

শেষ পৃষ্ঠার পর

করবো। জুলাই মাস থেকে প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষকদের উৎপাদন সহায়তার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বাজেট জনগণের মৌলিক প্রয়োজন ও সংগ্রামের অগ্রাধিকার বিবেচনায় রেখে বরাদ্দ প্রদান করেছে।

আমরা এমন একটি অর্থনৈতিক কাঠামো নির্মাণ করছি যেখানে জনগণের সম্পদ জনগণের হাতেই থাকবে এবং শোষণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রতিটি টাকা ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপযোগিতা নিশ্চিত করা হবে, যাতে জনগণই এর প্রকৃত উপকারভোগী হয়। মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) ৪% পুঁজিগত ব্যয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে, যা উৎপাদন শক্তির সম্প্রসারণে ব্যবহৃত হবে। উৎপাদিত সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণির হাতে এর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ না থাকে। কৃষি-শিল্প এবং পরিষেবা খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। স্থানীয় উদ্যোগ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে, যাতে শ্রমজীবী মানুষ আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এবং বড় পুঁজিপতিদের একচেটিয়া আধিপত্য কমানো যায়। প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবা গরিব জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা হবে, যার জন্য বাজারকে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণির স্বার্থে পুনর্গঠন করতে হবে। যেখানে প্রয়োজন, সেখানে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ভিত্তিতে মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হবে, তবে এটি কোনোভাবেই ধনিকশ্রেণির স্বার্থে ব্যবহৃত হতে দেওয়া যাবে না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ইতিহাসের সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি। এই বছর ৫% অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আশা করা হচ্ছে, যা শ্রমিক-কৃষকের পরিশ্রম ও উৎপাদনের সরাসরি ফল। দুর্নীতিবিরোধী সংগ্রাম আমাদের অর্থনৈতিক রূপান্তরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আমরা এমন এক অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরি করছি, যেখানে ২০২৮ সালের মধ্যে ঋণ পরিশোধ শুরু করা যাবে। ঋণের দায়ে জনগণকে জিম্মি রাখা চলবে না। স্থিতিশীল বিনিময় হার নীতি গ্রহণ করা হবে, যাতে বৈদেশিক পুঁজির দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই বছর ১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। রপ্তানি সম্প্রসারণ করা হবে, তবে কৃষি ও শ্রমজীবী মানুষের শোষণমূলক বাণিজ্যিকীকরণ রোধ করতে হবে। জাতীয় রপ্তানি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে, যাতে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা কমিয়ে আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তোলা যায়। সরকারি মালিকানাধীন জমিগুলোকে উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য লিজ দেওয়া হবে। অর্থনৈতিক রূপান্তর আইন সংশোধন করা হবে, যাতে জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা যায়। আমদানি-রপ্তানি ও শুল্ক ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ করতে নতুন শুল্কনীতি প্রণয়ন করা হবে।

শ্রমিক-কৃষকদের জন্য রাষ্ট্রের বিনিয়োগ বাড়ানো হবে এবং তাদের অধিকার রক্ষায় কঠোর আইন প্রণয়ন করা হবে। রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যাংকসমূহকে উন্নয়ন ব্যাংকে রূপান্তর করা হবে, যাতে গরিব জনগণের আর্থিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়। গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে ১০ বিলিয়ন রুপি বিনিয়োগ করা হবে। শ্রমিক ও কৃষকের অধিকার সুরক্ষিত না হলে কোনো উন্নয়ন অর্থবহ হবে না। দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি দেউলিয়া আইন খসড়া করা হবে, যা মূলধারার পুঁজিবাদী ব্যর্থতাগুলোর সমাধানে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবে। সরকার ও জনগণের যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য একটি নতুন পাবলিক-

প্রাইভেট পার্টনারশিপ আইন প্রণয়ন করা হবে। দেশের উৎপাদন ও রপ্তানির মান উন্নয়নে একটি জাতীয় গুণগত ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন করা হবে, যার জন্য এই বছর ৭৫০ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে। বন্দরের পণ্য ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ ও গণমুখী করতে ৫০০ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ দেওয়া হবে, যাতে শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাড্য কমে।

জনগণের জন্য সর্বজনীন ডিজিটাল পরিচয়পত্র ব্যবস্থা চালু করা হবে। শিল্প ও পরিষেবা খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পরিকল্পিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডিজিটাল অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে ডিজিটাল ইকোনমি কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে। ডাটা সুরক্ষা আইন আরও কঠোর করা হবে, যাতে জনগণের ব্যক্তিগত তথ্য করপোরেট পুঁজির হাতে চলে না যায় এবং জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষিত হয়। কাগজে মুদ্রা ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া হবে এবং ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে। ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশ ত্বরান্বিত করতে ৩ হাজার মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হবে, যা শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করবে এবং কর্পোরেট একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

ডিজিটাল অর্থনীতি জাতীয় অর্থনীতির ১২% অর্জনের লক্ষ্যে সম্প্রসারিত হবে। বার্ষিক তথ্যপ্রযুক্তি খাতের আয় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার জন্য শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে। পর্যটন খাতে ডিজিটাল টিকিটিং ব্যবস্থা চালু করা হবে, যাতে মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ বন্ধ হয় এবং শ্রমিকদের মজুরি নিশ্চিত হয়। পর্যটন শিল্পের প্রসার ও শ্রমজীবী জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য ৫০০ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশকে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। গবেষণা ও নতুন আবিষ্কারকে বাণিজ্যিকীকরণের জন্য ১০ বিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে, এটি জনগণের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে।

প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীদের জন্য নির্ধারিত সরকারি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যাতে জনগণের সম্পদ আর ব্যক্তিগত বিলাসিতায় অপচয় না হয়। সরকার মার্চের মধ্যেই সমস্ত বিলাসবহুল গাড়ি নিলামে তুলবে এবং ২০২৫ সালে কোনো সংসদ সদস্য নতুন গাড়ি পাবে না।

‘পুষ্টিকর খাদ্য মিশ্র’ কর্মসূচির আওতায় মা ও শিশুদের পুষ্টির জন্য ৫ বিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে। নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচির জন্য ১২০ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে, যা শ্রমজীবী ও দরিদ্র নারীদের আত্মনির্ভরশীল করতে সহায়তা করবে। জনগণের মৌলিক স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করতে ১০ হাজার এর বেশি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। স্বাস্থ্যসেবায় ডিজিটাল ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়ানো হবে। গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টির জন্য ৭ বিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে, যা শ্রমজীবী ও নিম্নবিত্ত নারীদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চা বাগান হাসপাতালগুলোর জন্য চিকিৎসাকর্মী ও ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। ওষুধ সংকট হবে না বলে সরকার ঘোষণা করেছে। অটিজম শিশুদের জন্য পাঁচ বছরের জাতীয় কর্মসূচি চালু করা হবে।

স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১০ বিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সকালের খাবার কর্মসূচির জন্য বাজেট উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে, যাতে দরিদ্র শিশুদের অপুষ্টি রোধ করা যায়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের ভাতা বৃদ্ধির করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বৃত্তির পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়ানো

হয়েছে, যা শ্রমজীবী পরিবারগুলোর সন্তানদের জন্য শিক্ষা আরও সহজলভ্য করবে। মহাপ্রলয় বৃত্তি এবং পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য ৫ বিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে পাঁচটি প্রদেশে ক্রীড়া বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে, যাতে শ্রমজীবী তরুণদের দক্ষতা বিকশিত হয়। নির্বাচনের সময় ঐতিহাসিকভাবে গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। জাফনা গ্রন্থাগার ছিল সেই দুঃসহ আত্মসানের অন্যতম শিকার। জাফনা ও পার্শ্ববর্তী দ্বীপের ছাত্র-ছাত্রীরা এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করে, যা জনগণের সাংস্কৃতিক বিকাশের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। জাফনা গ্রন্থাগারের জন্য ১০০ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য ২০০ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে।

নিরাপত্তামূলক রিজার্ভের পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করা হবে, যাতে খাদ্য সংকট বা বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির কোনো সুযোগ না থাকে। ধান সংগ্রহের জন্য ৫ বিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের সুরক্ষা দেবে এবং বাজারের দালালদের হাত থেকে তাদের মুক্তি দেবে। ধান চাষিদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সার সহায়তা দেওয়া হবে।

মধ্যস্বত্বভোগীদের কবল থেকে কৃষকদের বাঁচাতে চাল বিপণন আইনে পরিবর্তন আনা হবে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থায়ন হিসেবে ৫০০ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে। অব্যবহৃত জমি উন্নয়নে ২৫০ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে, যাতে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি ব্যবস্থা ধ্বংস করে ভূমিহীন কৃষকদের উৎপাদনের সুযোগ দেওয়া যায়। দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও মূল্য শৃঙ্খলা উন্নয়নের জন্য ২.৫ বিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে, যাতে বিদেশি দুগ্ধ পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমে এবং স্থানীয় উৎপাদনকারীরা লাভবান হয়।

সমবায় কাঠামো উন্নয়নের জন্য ১০০ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে, যা পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণকে দুর্বল করে শ্রমজীবী কৃষকদের সংঘবদ্ধ করবে। সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ৭৮ বিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে পুরনো সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১২ বিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্ধিত আন্তর্জাতিক চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে নারিকেল উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দারুচিনি ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য, মৎস্য খাতের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে।

বয়স্ক ভাতা প্রায় দ্বিগুণ বাড়ানো হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। এতিম শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। প্রতিষ্ঠানিক যত্নে থাকা শিশুদের কল্যাণে ৫০০ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে। উচ্ছেদ হওয়া শিশুদের জন্য স্থায়ী আবাসন নির্মাণে ১ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে, যাতে তারা গৃহহীন না থাকে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ১০০ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে। পুনর্বাসিত ব্যক্তিদের সহজে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যাতে তারা সমাজে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের জন্য ৫ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে, যা শ্রমজীবী ও দরিদ্র শ্রেণির সুরক্ষা দেবে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির জন্য ২৫ মিলিয়ন রুপি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, যা জনসাধারণের ক্ষতির বোঝা কমাতে। উৎসব মৌসুমে দরিদ্রদের জন্য ১০ মিলিয়ন রুপি মূল্যের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হবে।

বিদেশ ফেরত শ্রমিকদের বিমানবন্দর কর মওকুফের সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। শ্রমজীবী

মানুষের জন্য গণপরিবহন পরিষেবা উন্নত করতে ৩০০০ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে। রেলওয়ের জন্য ৫০০ মিলিয়ন রুপি, বরাদ্দ করা হয়েছে। এয়ারলাইন্সের দীর্ঘদিনের ঋণ পরিশোধের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ৫ বিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে, যা কর্পোরেট দূষণের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে। মানুষ ও হাতির সংঘাত রোধের জন্য ৩০০ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে, যাতে কৃষিজীবী জনগণের জীবন-জীবিকা সুরক্ষিত হয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনকারী পুঁজিপতিদের বন উজাড়ের প্রক্রিয়া বন্ধ করা যায়।

শিল্পী ও সাংবাদিকদের জন্য ১৮০টি আবাসন নির্মাণ করা হবে। জলসংকট সমাধান ও নতুন জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য ১০ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক আনুগত্যকে ভিত্তি করা হবে না। শিক্ষিত বেকারত্ব সমাধানে সরকারি খাতে ১০ লাখ দক্ষ কর্মী নিয়োগের জন্য ১০ বিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে।

সরকারি খাতে ন্যূনতম বেতন ৪০,০০০ রুপিতে উন্নীত করা হয়েছে, যা মুদ্রাস্ফীতির কমাতে। চলতি বছরে সরকারি খাতে বেতন বৃদ্ধির জন্য ১১০ বিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে বেতন বৃদ্ধির এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে, যেখানে ১৭,০০০ থেকে ৩০,০০০ রুপি পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধির নিশ্চয়তা থাকবে। বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হার ২৫০ রুপি থেকে ৪৫০ রুপিতে উন্নীত করা হয়েছে, যাতে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বেড়ে যায়। বাগান শ্রমিকদের জন্য প্রতিদিনের ন্যূনতম মজুরি ১৭০০ রুপি নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২০ সালের ১ জানুয়ারির আগে অবসর নেওয়া পেনশনভোগীদের পেনশন তিন ধাপে বাড়ানো হবে, যাতে প্রবীণ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের কবলে না পড়ে।

প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উচ্চপদস্থ ও নিম্নস্তরের সব দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। ট্যাক্স প্রশাসনের ডিজিটাল করা হবে যার মাধ্যমে কর ফাঁকি রোধে কর্পোরেট পুঁজিপতিদের ওপর নজরদারি বাড়ানো হবে। অবৈধ আর্থিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে কঠোর নীতি গ্রহণ করা হবে। ধীরে ধীরে শ্রীলঙ্কাকে ক্যাশলেস সমাজে পরিণত করা হবে। ডিজিটাল ও স্বচ্ছ অর্থনীতির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। করদাতাদের টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। ঘুষ ও দুর্নীতি মুক্ত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা করা হবে। জনগণকে প্রতারণা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। বিনিয়োগকারীদের কাছে ঘুষ চাওয়া হলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। পুলিশ বাহিনীতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। নিম্ন ও উচ্চস্তরের সব দুর্নীতিবাজ পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিদেশে থাকা শ্রীলঙ্কানদের বিনিয়োগকে জনস্বার্থে ব্যবহার করা হবে, কর্পোরেট শোষণ নয়।

আমরা ঘোষণা করছি—ধর্ম, জাতি ও লিঙ্গভিত্তিক বিভেদ নয় বরং শ্রেণিগত ঐক্যকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। শোষণের সকল পথ রুদ্ধ করা হবে। শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে সকল কর্মসূচিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

শ্রীলঙ্কার বাজেট প্রণয়নের দৃষ্টান্ত আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবো। কারণ বাজেট শুধু টাকা বরাদ্দের হিসাব নয়, বাজেট হলো সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। সরকার জনগণের স্বার্থ না বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে তা বাজেট থেকে ধারণা করা যায়।

অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে বাজেট প্রণয়নে তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার বাজেট আমাদের সহায়তা করবে এই বিবেচনায় লেখাটি প্রকাশ করা হলো।

রানা প্লাজা ধসের একযুগ : শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত হয়েছে কি?

শেষ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। সাভারের রানা প্লাজা ধসের সেই ভয়াবহ দিনের কথা আমরা নিশ্চয় ভুলি নাই। শুধু বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীতে কারখানা ধসে এত শ্রমিকের মৃত্যুর নজির খুব বেশি নাই। এই ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের শ্রমিকদের জীবন কতটা নিরাপত্তাহীন।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কারখানা দুর্ঘটনা হিসেবে রানা প্লাজা ভবন ধসকে বিবেচনা করা হলেও তা থেকে শিক্ষা নেয়া হয়েছে কতটুকু তা এখনও প্রশ্ন সাপেক্ষ। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সালের এই ভবন ধসের ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ১১৩৮ জন যাদের মধ্যে ২৯১ জনের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। আহত হয়েছিলেন ২৫০০ জন। নিহতদের সমাধিস্ত করা হয়েছে জুরাইনে অচিহ্নিত শ্রমিকদের কবরস্থানে। এই ভয়াবহ কাঠামোগত হত্যার আগেই ২০১২ সালে তাজরিন অগ্নিকাণ্ডে জীবন হারিয়েছিলেন ১১২ জন, তার দগদগে স্মৃতি মন থেকে মুছে যেতে না যেতেই রানা প্লাজা ভবন ধস শুধু বাংলাদেশে নয় সারা পৃথিবীতেই নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু ১২ বছর পর হিসেব করে দেখা যাচ্ছে এই ঘটনা যতটা আবেগকে নাড়া দিয়েছিল ততটা দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করেনি সংশ্লিষ্ট কাউকে। ফলে ২০১৬ সালে টাম্পাকো এবং ২০১৭ সালে মাল্টি ফ্যাবস কারখানা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ছোট বড় নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে, বড় দুর্ঘটনারও বিরাম নেই। ২০২১ সালের জুলাই মাসের ৮ তারিখে হাশেম ফুড এন্ড বেভারেজ কারখানায় আগুন লেগে ৫২ জনের মৃত্যু মনে করিয়ে দেয় সস্তা শ্রমিকের জীবনটাও কত অবহেলার।

শ্রমিক কাজ করতে আসে জীবনকে উন্নত করতে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এবং মৃত্যু যেন শ্রমিকদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেফটি এন্ড রাইটস নামের একটি বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে সংবাদপত্রে প্রকাশিত দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর খবর জরিপ করে দেখানো হয়েছে ২০০৯ থেকে ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৬ হাজার ৬৮১ জন। অগ্নি সচেতনতা, অগ্নি সতর্কতা আর অগ্নি নিরাপত্তার ব্যবস্থা এতই নাজুক যে বলা হয় প্রতি ২ দিনে একটি অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। বড় আকারের প্রতিষ্ঠান এবং বেশি পরিমাণ প্রাণহানি না ঘটলে তা সাড়া ফেলে না, শোরগোল তোলে না। আড়ালেই থেকে যায় দুর্ঘটনা আর মৃত্যুর খবর। কর্মক্ষম মানুষকে হারিয়ে শ্রমজীবী পরিবারগুলো যে কী অসহায় হয়ে পড়ে তা নজরে আসে না। বাংলাদেশে পেশাগত দুর্ঘটনার বিলস কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, গত ১২ বছরে (২০১৩-২০২৪) ১০ হাজার ২১০ জন নিহত হয়েছেন।

বাংলাদেশে যে সমস্ত শিল্পকারখানা/ প্রতিষ্ঠানে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে (যেমন, সারাকা গার্মেন্টস, স্পেক্ট্রাম গার্মেন্টস, রানা প্লাজা, তাজরিন গার্মেন্টস, টাম্পাকো ফয়েলস, এফআর টাওয়ার, বিএম ডিপো, শেজান জুস, নিমতলী ট্রপ্যাজেডি, বেইলি রোড ট্রপ্যাজেডি, এস এন

কর্পোরেশনের গ্রীনইয়ার্ড ইত্যাদি) এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত করা হয়েছে, তার প্রতিবেদন কখনই জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি। ফলে দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যেসকল সুপারিশ করা হয়েছে তা অন্ধকারে রয়ে গেছে।

রানা প্লাজা ধসের পর কিছু প্রশ্ন উঠেছিল। এই সব দুর্ঘটনা কী নিছক দুর্ঘটনা নাকি কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড? দুর্ঘটনাগুলো কী আকস্মিক নাকি অনিবার্য ছিল? কেউ বা কারা কী এর দায় নেবে না? বাংলাদেশে চাইলেই কি কোন কারখানা বা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা যায়? প্রায় ১৭টি প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ছাড়া কোন শিল্প কারখানা স্থাপন করা

যায় না। ফ্যাক্টরি প্লান পাশ করাতেই তো জমির কাগজপত্র লাগে, সাইট প্লান, মাস্টার প্লান লাগে, কন্সট্রাকসন প্লান লাগে, মেশিন লে-আউট ও ম্যনুফ্যাকচারিং ফ্লো চার্ট লাগে। তাহলে ভবন ধসের পর সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠে, ভবন নির্মাণের অনুমতি দেন যারা তাঁরা কী দায়িত্ব পালন করেছিলেন? কারখানা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো কি নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়? এখানে দুর্নীতি না দায়িত্বহীনতা কোনটা প্রধান সমস্যা? নাকি দুর্নীতির কারণেই নিয়ম থাকা সত্ত্বেও দায়িত্বে অবহেলা করা হয়েছিল?

আইন নাগরিককে সুরক্ষা দেয়। প্রশ্ন উঠে সেখানেও। আইন কোন নাগরিককে সুরক্ষা দেয়? ক্ষমতাবানের ক্ষমতার সুরক্ষা নাকি দুর্বলের ন্যূনতম অধিকারের সুরক্ষা? একটি অপরাধ বা অন্যায়ের শাস্তি হলে যেমন অপরাধ প্রবণতা কমতে থাকে, তেমনি অপরাধ করে পার পেয়ে গেলে প্রবণতা বাড়ে। ২০০৫ সালের ১১ এপ্রিল স্পেকট্রাম কারখানার ভবন ধসে ৮০ জন শ্রমিকের মৃত্যুর পর যদি কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ নিতেন তাহলে ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজার দুঃখজনক ঘটনা হয়তো ঘটত না।

রানা প্লাজা ভবন ধসের পর ২০১৩ সালে একটা রিট পিটিশন করা হয়েছিল ব্লাস্ট এবং আসক এর পক্ষ থেকে। এখনও তার নিষ্পত্তি হয়নি। শ্রম আদালতে ১১টি ফৌজদারি মামলা ২০২৫ সাল পর্যন্ত চলমান আছে। মামলার দীর্ঘ সূত্রিতা যে বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি অনাস্থা তৈরি করে তা কি বলার অপেক্ষা রাখে। একটা গবেষণায় দেখা গেছে শ্রম আইন অনুযায়ী ৬০ কর্ম দিবসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির বিধান থাকলেও মামলা নিষ্পত্তিতে গড়ে সময় লেগেছে ৬৩০ দিন অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের ১০ গুণ বেশি। আবার যে সমস্ত মামলার রায় ঘোষিত হয় সে রায় বাস্তবায়ন হয় না। সে ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ আদালতের রায় উপেক্ষা করে বলে ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়। আইন এবং আদালতকে উপেক্ষা করার এই নজিরকে উপেক্ষা করলে আইনের শাসনের কথা যতই বলা হোক না কেন তা অরণ্যে রোদনের মতই নিষ্ফল হবে।

কর্ম ক্ষেত্রে শ্রমিক মৃত্যুবরণ করলে পরিবার পাবে ২ লাখ টাকা এবং চিরস্থায়ী পঙ্গু হলে আড়াই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন। এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কি হাস্যকর নাকি উপহাসের সামিল তা নিয়ে বিতর্ক করা যাবে। কিন্তু একজন মানুষের জীবনকে এবং জীবিকাকে যে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক করার প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই কারো হবে না। দেশের জিডিপি বাড়ছে, মাথাপিছু আয় বাড়ছে। মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৭৮৪ ডলার হিসেবে একজন শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত যে কোন বয়সী নাগরিকের আয় বার্ষিক ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকার বেশি। আর উৎপাদনের চাকা ঘোরান যারা তাদের জীবনের চাকা থেমে গেলে ক্ষতিপূরণ ২ লাখ টাকা। শ্রমিকের জীবন নিয়ে একি তামাশা নয়? এই তামাশা শেষে বিয়োগান্তক বেদনা ও অপমানে পর্যবসিত হয় যখন সেই ক্ষতিপূরণ পাবার জন্যও বছরের পর বছর ঘুরতে হয়।

রানা প্লাজা ভবন নির্মাণ হয়েছিল অবৈধভাবে, ফাটল দেখা যাওয়ার পর শ্রমিকরা কাজে যেতে চায়নি, তাদেরকে জোর করে কাজে পাঠানো হয়েছে, শ্রমিকরা চাকরি হারাবার ভয়ে কাজে যোগ দিয়েছে, ভবনে জেনারেটর নিয়মানুযায়ী স্থাপন করা হয়নি, ভবন ধসের পর বিরোধী দলের কর্মীরা পিলার ধরে বাঁকি দিয়েছে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বক্তব্য দিয়েছেন, ৫টি কারখানায় প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক কাজ করতেন কিন্তু কোন ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না সেখানে এই সব তথ্য কী প্রমাণ করে? শ্রম দপ্তর, পরিদর্শন দপ্তর এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি কেউ কি তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন, দায় এড়াতে পারবেন কি কেউ?

দেখা গেছে ২৯টি ব্রান্ড রানা প্লাজায় অবস্থিত

৫টি ফ্যাক্টরিতে তৈরি পোশাক এর অর্ডার দিতো। তাদের কী কোন দায় ছিল না কর্ম পরিবেশ দেখার ব্যাপারে? একটা হিসেব দাঁড় করিয়েছিল ক্রিন রুথ ক্যাম্পেইন নামের একটি সংস্থা। তাঁরা দেখিয়েছে একটি টি শার্টের বিক্রয় মূল্যের মাত্র দশমিক ৬ শতাংশ পান শ্রমিক অর্থাৎ ১০০ টাকার টি-শার্টে শ্রমিকের প্রাপ্তি মাত্র ৬০ পয়সা। কারখানা মালিক ৪ শতাংশ পান লাভ হিসেবে, ইউরোপ আমেরিকার নামকরা ব্রান্ড পায় ১২ শতাংশ আর ইউরোপ আমেরিকার বিক্রেতা পায় ৫৯ শতাংশ। ফলে শ্রমিকরা রক্ত পানি করা শ্রমে মুনাফা জোগায় দেশি-বিদেশি মালিকদের। ফলে শ্রমিক ভবনের নিচে চাপা পড়লে কিংবা আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করলে তা দেখা যায়। কিন্তু প্রতিনিয়ত যে লোভের আগুনে পুড়ছে, মুনাফার পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ছে তা কিন্তু সহজে চোখে পড়ে না।

গার্মেন্টস বা তৈরি পোশাকের ব্যবসা বিশাল। সারা পৃথিবীতে প্রায় আড়াই ট্রিলিয়ন ডলারের শিল্প এই পোশাক শিল্প আর ৪ কোটি শ্রমিক খাটছেন এই খাতে। বাংলাদেশের মালিকরা ১০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যে কাজ করছে। পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ তুরস্ক, ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়াকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানির দেশ। কিন্তু শ্রমিকের মজুরি দেয়ার দিক থেকে পৃথিবীতে সর্বনিম্ন দেশের নাম বাংলাদেশ। ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করে এই শিল্পে। তাদের মজুরি বাড়ে ধীর গতিতে, তারা অন্যায়ের শিকার হয়ে আদালতে এসে প্রাণ হারালে ক্ষতিপূরণ নগণ্য, আইনে তাদের অধিকার সুরক্ষিত নয় বরং উপেক্ষিত, তাদেরকে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে বিদেশি বায়ার আর দেশি মালিক একজেট কিন্তু শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া এবং ট্রেড ইউনিয়ন করার ব্যাপারে পদে পদে বাধা। যে কারণে ৪ হাজারের বেশি কারখানায় ইউনিয়নের সংখ্যা ১৩ শতের কাছাকাছি। এদের মধ্যে কতটা ইউনিয়ন কাজ করতে পারে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

রানা প্লাজা ধস দেখিয়েছে অনেক কিন্তু শিখিয়েছে কী কিছু? শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকা রক্ষা, ন্যায্য মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার আর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণ, আহতদের চিকিৎসা পুনর্বাসনের কাজে যে অনেক পিছিয়ে আছি আমরা প্রতি বছর রানা প্লাজা দিবস সে কথাই মনে করিয়ে দেয়।

রানা প্লাজার আগে ও পরে গার্মেন্ট শিল্পে ২১৮টি দুর্ঘটনায় প্রায় তিনহাজার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নির্মান-পরিবহন, রি-রোলিং স্টিল, কেমিক্যাল, জাহাজ ভাঙা শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েক হাজার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বিভিন্ন দুর্ঘটনায় এত শ্রমিকের মৃত্যুর পরও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার ব্যবস্থা না রাখা ও অবহেলাজনিত কারণে মৃত্যুর দায়ে কোনো মালিকের শাস্তি হয়নি।

বাংলাদেশে ৭ কোটি ৪০ লাখ শ্রমজীবী মানুষ, এরাই উৎপাদনের প্রধান চালিকাশক্তি। কল কারখানা, কৃষি ক্ষেত্র, সেবা খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান অর্থবছরে ৫০ লাখ কোটি টাকার বেশি সম্পদ সৃষ্টি করবে তারা যাকে আমরা জিডিপি বলি। দেশের রপ্তানি আয় ৫৬ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে গার্মেন্ট খাত থেকে গত বছর ৪৬ বিলিয়ন ডলার বা ৫ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা আয় হয়েছে যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮২ শতাংশ। শ্রমিকের শ্রমের ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়, জিডিপি বাড়ে কিন্তু সবচেয়ে কম মজুরি পায় তারা। গার্মেন্ট শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বনিম্ন ১২,৫০০ টাকা। এরপর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকের মজুরি বাড়েনি। তাদের শ্রম যেমন সস্তা, তাদের জীবনটাও তেমনি কমদামি। শ্রমিকের শ্রম দিয়ে একদল মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ে, বিদেশে

টাকা পাচার করে অথচ সেই শ্রমিক শ্রমের ন্যায্য মজুরি পায় না, কাজ করতে এসে মৃত্যুবরণ করে পঙ্গু হয়, তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পায় না।

রানা প্লাজার এক যুগ পরেও তাই শ্রমিকদের দাবি তুলতে হচ্ছে

ক. কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের মৃত্যু হলে আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. কর্ম ক্ষেত্র নিরাপদ করতে ব্যর্থ হলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. শ্রমিকের মানসম্পন্ন জীবনযাপন উপযোগী মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।

ঘ. দুর্ঘটনায় আহত, পঙ্গু শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ, আজীবন চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. মালিকের অবহেলার কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে মালিকের সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

চ. কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বিমা ইআইআইএস বাধ্যতামূলক করতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা কনভেনশনের বক্তব্য
কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, শ্রমিক আন্দোলনে সচেতনতা অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক ফেডারেশনকেই এই কাজটা করতে হবে। কার্ল মার্কস ট্রেড ইউনিয়নকে বলেছিলেন ‘স্কুল অব কমিউনিজম’। অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন হলো এমন এক প্রতিষ্ঠান, যেখানে শ্রমিকরা কেবল নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে লড়াই করে না, বরং ধীরে ধীরে তারা শ্রেণিসচেতন হয়ে ওঠে, নিজেদের শোষিত শ্রেণি হিসেবে চিনতে শেখে এবং সমাজ পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হয়। গুরুত্ব ট্রেড ইউনিয়ন কেবল মজুরি, কর্মঘণ্টা, কর্মপরিবেশ ইত্যাদি ইস্যুতে মালিকপক্ষের সাথে অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম করে। কিন্তু এই লড়াই করতে গিয়েই শ্রমিকরা বুঝতে পারে যে, সমস্যাগুলো কেবল আলাদা আলাদা কারখানার নয়, বরং গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সমস্যা। এই উপলব্ধি থেকেই তারা ধীরে ধীরে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে।

তিনি আরও বলেন, আলোচনায় এসেছে রানা প্লাজা ধসে শ্রমিকের মৃত্যু কী দুর্ঘটনা, নাকি কাঠামোগত হত্যা? শ্রমিকদের যখন মুনাফার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে কাজ করতে বাধ্য করা হয়, যখন সেখানে নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, দায়িত্ব অবহেলা যখন মালিকের নীতিগত অবস্থান হয়, তখন সেটা হয় কাঠামোগত হত্যা। আর দুর্ঘটনা হচ্ছে—আকস্মিক, অনিচ্ছাকৃত, যান্ত্রিক ত্রুটি, যখন দায় খুঁজে পাওয়া যায় না সেটা। ফলে, রানা প্লাজায় মৃত্যু হচ্ছে কাঠামোগত হত্যা।

রানা যুবলীগ করত বলে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় তার বিচার এগোয়নি কিন্তু বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারও তো বিচারের কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এর ব্যাখ্যা কী? এটা শ্রমিকদের ব্যাপার বলে সরকারের অবহেলা! শ্রমিক যখন বকেয়া বেতন চায়, কারখানা খোলার দাবি করে, তখন সরকার সেখানে দ্রুত পুলিশ পাঠিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেয়। শ্রমিকের কর্মক্ষেত্র নিরাপদ করার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে মালিককে বাধ্য করতে তেমন পদক্ষেপ দেখা যায় না। শ্রমিক অপরাধ করলে যেমন শাস্তি পাবে, তেমনি মালিক অপরাধ করলে, বেতন দিতে না পারলে, কারখানা বন্ধ করলে তার বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ নিতে হবে। শ্রমিকের জন্য একরকম মালিকের জন্য আরেকরকম এটা হতে পারে না।

তিনি রানা প্লাজা ধসে দায়ী মালিক রানা সহ সকলের দ্রুত বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত, নিহত-আহত সকলের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জোর দাবি জানিয়ে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান। একই সাথে শুধু অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

সেলিম মাহমুদ ও রবিনটেক্স শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ববৃন্দের মিথ্যা মামলা তুলে নাও



সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ও গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ ও রবিনটেক্সের গ্রেপ্তারকৃত শ্রমিকদের নিঃশর্ত মুক্তি, হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও শ্রম আইন বাস্তবায়নের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ১৮ এপ্রিল '২৫ ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

নেতৃত্ব বলেন, কোন মামলা ছাড়া হয়রানিমূলকভাবে ১৫ এপ্রিল রাত দেড়টায় নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার বাসা থেকে গ্রেট ভেঙে বেআইনিভাবে যৌথ বাহিনী সেলিম মাহমুদকে গ্রেপ্তার করে রূপগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। তাকে ৯ এপ্রিল রবিনটেক্স কারখানার মালিকের করা মামলা এবং একই তারিখে পুলিশের করা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

নেতৃত্ব বলেন, রবিনটেক্স শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন ও নিবন্ধনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই কারখানা কর্তৃপক্ষ একের পর এক বেআইনি পদক্ষেপ নিতে শুরু করে এবং শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চালায়। একপর্যায়ে মালিক অবৈধভাবে শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করে।

ফলে, চাকরিচ্যুত শ্রমিকরা ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শুরু করে। সে আন্দোলন দমন করতে পুলিশ ও যৌথবাহিনী

শ্রমিকদের লাঠিপেটা করে অনেককে গুরুতর আহত করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৯ এপ্রিল আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে ৭৮ জনের নামে এবং শতাধিক অজ্ঞাত আসামি করে মামলা দায়ের করে। মামলায় প্রস্তাবিত রবিনটেক্স শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সীমা আক্তারসহ ২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নেতৃত্ব বলেন, সেলিম মাহমুদ এই মামলায় আসামি না হলেও, শ্রমিকদের আইনি সহায়তা দেয়ার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস।

সমাবেশে নেতৃত্ব বলেন, ইউনিয়ন করা, সংগঠিত হওয়া শ্রমিকের গণতান্ত্রিক অধিকার। মালিকরা শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার হরণ করছে। রাষ্ট্র ও প্রশাসন মালিকপক্ষের পক্ষ নিয়ে শ্রমিকের বিরুদ্ধে নিপীড়কের ভূমিকা পালন করছে।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন-এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল এর সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, শাহজাহান তালুকদার, সহ-সম্পাদক নবকুমার কর্মকার, ইমাম হোসেন খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদুজ্জামান লিপন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জুলফিকার আলী, অর্থ সম্পাদক আবু নাসিম খান বিপ্লব, কৃষি শ্রমিকবিষয়ক সম্পাদক সাইফুজ্জামান টুটুল, নির্বাহী সদস্য আবু জাফর, আফজাল হোসেন, রাহাত আহমেদ, এস এম কাদির প্রমুখ। সংহতি জানিয়েছেন বাংলাদেশ ওএসকে গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জেল

হোসেন।

দাবিসমূহ :

১. গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদসহ রবিনটেক্সের গ্রেপ্তারকৃত সকল শ্রমিকের নিঃশর্ত মুক্তি।

২. বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল কর, সকল মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার কর।

৩. শ্রম আইন লঙ্ঘনকারী রবিনটেক্স কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

৪. চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্বহাল ও ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিতকরণ।

৫। ইউনিয়ন নিবন্ধনের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা ও শ্রম আইনের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সরকারের হস্তক্ষেপ।

গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট

গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক

সেলিম মাহমুদ ও রবিনটেক্স শ্রমিক ইউনিয়নের গ্রেপ্তারকৃত শ্রমিকদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং শ্রমিক নিপীড়ন বন্ধের দাবিতে ২৪ এপ্রিল সংগঠনের সভাপতি আহসান হাবিব বুলবুল-এর সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. সৌমিত্র কুমার দাসের সঞ্চালনায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

নারায়ণগঞ্জ

বাসদ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট, রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট, নারায়ণগঞ্জ জেলা শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ ধারাবাহিকভাবে কর্মসূচি পালন করে। দেশের বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ সেলিম মাহমুদের মুক্তির দাবিতে কর্মসূচি পালন করে।



ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ খেলা : কার লাভ কার ক্ষতি

দশম পৃষ্ঠার পর

নেওয়া ও বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয় আলোচনার শর্ত ভঙ্গ করে আর যুদ্ধ শেষ হয় আলোচনার টেবিলে বসে। মাঝখানে থাকে রক্তের স্রোত, জীবন ও সম্পত্তি হারানো মানুষের দীর্ঘ সারি আর হাহাকার। যুদ্ধের আগুনে ঘর পুড়লেও সেখানে আলু পোড়ানোর চেষ্টা চলে। অস্ত্র বিক্রেতার তৎপর অস্ত্র বিক্রি করতে, ক্ষমতাসীনরা যুদ্ধকে কাজে লাগিয়ে ভোট এবং ক্ষমতা সংহত করে, জনগণের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেয়া যেন দেশ চালাতে সরকারের ব্যর্থতা আড়াল করা যায়। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধেও সেটাই ঘটছে।

বাংলাদেশ এ পরিস্থিতিতে নিরস্ত্র থাকতে পারে না। দুই দেশের সঙ্গেই আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। জনগণের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব আর পক্ষ-বিপক্ষে দাঁড়ানোর মানসিকতা প্রবল। যুদ্ধের ব্যয় বহন করতে গিয়ে অর্থনীতির যে কী হাল হয় তা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে বারবার। যুদ্ধ দুই দেশের মধ্যে হলেও শুধু দুই দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, গোটা বিশ্বেই তা ছড়িয়ে পড়ে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

দুই বছরেও যুদ্ধ শেষ হয়নি কিন্তু ৫ হাজার কিলোমিটার দূরের যুদ্ধ আগুন লাগিয়েছে বাংলাদেশের কারওয়ান বাজারের সবজির দামেও। লাভবান হয়েছে ব্যবসায়ীরা আর দুর্ভোগে পড়েছে জনগণ।

অতীতের মতো এবারও ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ স্থায়ী হবে না। হুংকার দিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি আর অস্ত্র স্বল্প যুদ্ধ এই নীতি অনুসরণ করবে দুই দেশ। কিন্তু এতে আন্তর্জাতিক মোড়লদের দুই দেশকে কেন্দ্র করে বলয় তৈরি এবং অস্ত্র ব্যবসাকে বাড়ানো আর নিত্যপণ্যের বাজারে অস্থিরতা তৈরির কাজ ভালোভাবেই এগুবে। যার খেসারত দেবে জনগণ। যুদ্ধ করবে সেনাবাহিনী আর ব্যপক হারে মৃত্যুবরণ করবে সাধারণ মানুষ। এই যুদ্ধ থামবে কিন্তু মুনাফা ও ব্যবসার আগুন দুই দেশে যুদ্ধংদেহী মনোভাব জাগিয়ে রাখবে বহুদিন। নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বৈরিতা, টাকার ব্যবহারের পাশাপাশি যুদ্ধ উন্মাদনা ব্যবহারের কুফল আমরা দেখছি। এর ফলে জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা মার খায়। ভারত-পাকিস্তানের এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতির শিকার হবে কাশ্মীর, উত্তেজিত থাকবে উপমহাদেশের জনগণ আর ভোট ও অস্ত্র ব্যবসার সুফল পাবে দেশি বিদেশী ব্যবসায়ীরা।

কালবৈশাখী বাড় এবং শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট তালিকা প্রদান



যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ২৮ এপ্রিল '২৫ কালবৈশাখী বাড় এবং শিলাবৃষ্টিতে কৃষকদের মাঠের ফসলের ব্যপক ক্ষতি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে ২৯ এপ্রিল জেলার ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগ্রাম পরিষদ এবং বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতৃত্ব যশোর জেলা

প্রশাসকের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের একটি তালিকা প্রদান করেন। জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

শিলাবৃষ্টিতে যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার সিংহবুলি, বলদেপাড়া, মশিউরনগর, কয়ারপাড়া, সদর উপজেলার ইছালীতে ফসলের ক্ষতি হয়।

ভারতের পানি আত্ৰাসন তিস্তা নদীর পানি সংকট

শেষ পৃষ্ঠার পর

তিস্তার পানিবন্টন সমস্যার সমাধান ও বাংলাদেশকে মরু্করণের কবল থেকে রক্ষার উপায় বের করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের উদ্যোগে ১০ এপ্রিল ’২৫, রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি হলে ‘তিস্তা কনভেনশন’ অনুষ্ঠিত হয়।
বাসদ রংপুর জেলা আছ্যায়ক কমরেড আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে আলোচনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, প্রবীন রাজনীতিক ভাষা সৈনিক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আফজাল, সিপিবি রংপুর জেলা কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাত হোসেন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আলী রায়হান সরকার, নদী গবেষক শেখ রোকন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাইফুল ইসলাম পল্টু, বাংলাদেশ মানবাধিকার ও পরিবেশ আন্দোলন (মাপা) রংপুর জেলা প্রধান নির্বাহী অ্যাড. এ এম মুনির চৌধুরী, নাগরিক আন্দোলনের নেতা ডা. সৈয়দ মামুনের রহমান প্রমুখ।

কমরেড খালেকুজ্জামান আলোচকসহ উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তিস্তাসহ বাংলাদেশের নদীগুলির এই মুর্মুর্ষদশার কারণ কী? এটা কতটা প্রাকৃতিক আর কতটা মনুষ্যসৃষ্ট। নদীর উৎপত্তি থেকে শুরু করে গতিপথের দেশগুলোর ভূমিকা কতটা দায়ী। এতে আমাদের দেশের শাসকদের ভূমিকা-অবহেলা কী? করণীয় কী ছিল? যারা উজানে বাঁধ নির্মাণ করে পানি প্রত্যাহার করে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করছে, তাদের ভূমিকা কী? কীভাবে আরও বেশি পানি প্রত্যাহার করবে সে পরিকল্পনার বিষয়ে আজকের আলোচকদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি। বাংলাদেশে পানির অভাবে ফসল উৎপাদন, প্রাণিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে। নদীর পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়েছে, প্রাণ-প্রকৃতি পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে।

বিশ্বব্যাতকের তথ্য অনুযায়ী, এক ফারাক্কার কারণেই বাংলাদেশ ৩০ লাখ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন কমেছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যমতে, গত ৫০ বছরে ৪০০ নদীর মধ্যে ২৭৯টি মৃতপ্রায় বা শুকিয়ে গেছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নামছে, খরার তীব্রতা বাড়ছে। নদীর প্রবাহ কমে যাওয়ায় প্রায় ২৬০ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির ঝুঁকিতে। হাওর অঞ্চলে বন্যার প্রবণতা বাড়ছে। নৌপরিবহন—যা এক নম্বরে থাকার কথা ছিল তা ধ্বংস হচ্ছে, অর্থনৈতিক ক্ষতি বাড়ছে, পরিবহন ব্যয় বেড়েছে। নদীকেন্দ্রিক জীবনধারা ক্রমাগত ধ্বংস হচ্ছে; মাঝি-জেলে, কামার-কুমারদের ঐতিহ্যবাহী পেশা বিলুপ্ত হচ্ছে। নদীভিত্তিক জীবিকা হারিয়ে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ছে।

তিনি আরও বলেন, জীবন্ত সত্ত্বা হিসেবে নদীকে দেশের হৃদপিণ্ডের রক্তপ্রবাহের সাথে তুলনা করা যায়। রক্তপ্রবাহ বন্ধ হলে মানুষ মারা যায়, তেমনি নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হলে বাংলাদেশের অস্তিত্বও হুমকিতে পড়ে। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি নদীবাহিত পলি, মাটি ও পানির সমন্বয়ে গঠিত একটি সক্রিয় বদ্বীপ। এই বৈশিষ্ট্য মরুভূমি বা বরফ আবৃত অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই এখানকার জীবনযাত্রা ও পরিবেশ প্রধানত নদী নির্ভর হতে বাধ্য যা শাসকশ্রেণির বোধে আজও আসেনি।

বাংলাদেশের নদীগুলির উৎস হিমালয়, তিব্বত-চীন, নেপাল, ভারত ও মিয়ানমার। বারো শ-এর অধিক নদীর তালাশ এখনও মেলেনি। দেশের অভ্যন্তরীণ নদীগুলির সঠিক

সংখ্যা, অবস্থা ও ইতিহাস নিয়ে সঠিক তথ্য নেই। উজানের দেশ ভারত নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করছে। যেমন, ভারত হয়ে আসা ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে অধিকাংশ নদীতে ইতিমধ্যে ভারতীয় বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে—কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এ সম্পর্কে জনগণকে স্পষ্ট তথ্য জানতে দেয়নি আর ভারতের সাথেও সমস্যা সমাধানে কার্যকর কূটনৈতিক উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। আন্তর্জাতিক মতামত গঠন ও চাপ প্রয়োগও তেমন সফলতা দেখাতে পারেনি। নদী দূষণ, অবৈধ দখল, ভরাট ও অপরিকল্পিত উন্নয়নের কারণে অভ্যন্তরীণ নদীগুলির অস্তিত্ব সংকটে।

তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টা চীনের পানিসম্পদমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে চীনের কাছে বাংলাদেশের নদ-নদীবিষয়ক ৫০ বছরের মহাপরিকল্পনা দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। তার অর্থ সরকারের নদীবিষয়ক সুনির্দিষ্ট স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা ও ভাবনা যে নেই তা দেশবাসীর কাছে পরিস্কার। নদী মাতৃক দেশে এ নিয়ে সরকারের একটা পরিকল্পনা থাকবে না, এটা কি ভাবা যায়? আমাদের নদীব্যবস্থাপনা নিয়ে চীন পরিকল্পনা করবে, বা অন্য কেউ করবে আর শাসকরা তা হলে কী করবে? এতে কি বিদেশ নির্ভরতার নতুন উদাহরণ তৈরি হয় না?

বাংলাদেশ নিজে এখনও পাঁচ বছরের একটি নদীবিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেনি। নদী কমিশন গঠন করা হলেও তাদের কাজের ফলাফল উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই দেখা যায় না। আমাদের নদী রক্ষায় একটি বিজ্ঞানভিত্তিক, দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। এ জন্য প্রয়োজন—নদীর অতীত ও বর্তমান অবস্থার সঠিক তথ্য সংগ্রহ। আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা। নদীকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি, কৃষি, মৎস্য, নৌপরিবহন ও পরিবেশের সমন্বিত পরিকল্পনা করা।

নদী শুধু পানির উৎস নয়—এটি বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির ভিত্তি। দেশ রক্ষা ও সমৃদ্ধিতে পানি সমস্যা সমাধান ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।

কনভেনশনের আলোচকবৃন্দ বলেন, আন্তর্জাতিক নদী আইন ও নদী কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, কোনো আন্তর্জাতিক নদীর পানি উজানের দেশ ভাটির দেশের স্বার্থ বিপন্ন করে একতরফাভাবে প্রত্যাহার করতে পারে না। কোনো দেশ নদী ও পানি ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা করলে সংশ্লিষ্ট উজান ও ভাটির দেশের সম্মতি ছাড়া তা করতে পারবে না। কিন্তু ভারত একতরফাভাবে গঙ্গা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্রসহ প্রায় সবগুলো নদীতে উজানে ভারতের সীমানায় বাঁধ নির্মাণ করে পানি প্রত্যাহার করে চলেছে, যা আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, উত্তরবঙ্গ বাংলাদেশের খাদ্যভাণ্ডার, কিন্তু ভারতের পানি আত্ৰাসনে এই অঞ্চল দরিদ্র জনপদে পরিণত হয়েছে। বিগত সরকারগুলো—যারা দেশ শাসন করেছে তারা ক্ষমতায় যাওয়া এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ভারতের সাথে নতজানু পররাষ্ট্র নীতির চর্চা করেছে। এরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জনগণের ওপর আস্থা ও ভরসা না রেখে ভরসা রেখেছে ভারতের ওপর, নির্ভরশীল হয়েছে তাদের অনুগ্রহের ওপর। তাই ন্যায্য অধিকারের জন্য শিরদাঁড় সোজা করে দাবি নিয়ে কথা বলতে পারেনি। ১৯৯৬ সালে আরবিট্রেশন ক্লজসহ কিছু ঘাটতি নিয়ে গঙ্গা পানি বন্টন চুক্তি হয়েছে একইভাবে তিস্তাসহ অন্যান্য নদীর জন্যও চুক্তি সম্পাদন করা যেত কিন্তু সরকারের তাগিদ বা কূটনৈতিক চাপ ছিল না বলে এক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০১১ সালে তিস্তা চুক্তির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু ভারতের

অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্ধোপাধ্যায় সরকারের বিরোধিতায় এই চুক্তি করা যায়নি। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও নিরাপত্তা খাতে ভারতের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতার কারণে দেশ হুমকির মধ্যে পড়েছে। আমরা ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দিয়েছি, রপ্তানির জন্য আমাদের বাজার উন্মুক্ত করে দিয়েছি কিন্তু ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পারিনি। আমাদের সীমান্তে ভারত প্রতি দিন মানুষ হত্যা করছে অথচ সরকার তার কোনো প্রতিকার করতে পারছে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, তিস্তা নদী বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রাণ। এটি বাংলাদেশের ৪র্থ বৃহত্তম নদী, যা উত্তরবঙ্গের জীবন-জীবিকার মূল উৎস। এই নদীর অববাহিকার ২০ হাজার বর্গকিলোমিটার বাংলাদেশে এবং ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার ভারতে অবস্থিত। ভারত বাংলাদেশের সাথে কোনো সমঝোতা ছাড়াই একতরফাভাবে উজানে গজলডোবায় বাঁধ নির্মাণ করে শুষ্ক মৌসুমে প্রায় সমস্ত পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। তিস্তার পানিপ্রবাহের ভয়াবহ সংকট শুষ্ক মৌসুমে প্রকট হয়। তখন পানি প্রবাহ ৫০০ কিউসেক-এ নেমে আসে, যা ঐতিহাসিক গড় ১০ হাজার কিউসেকের মাত্র ৫ শতাংশ।

তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে ১ লাখ ১০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়ার লক্ষ্য থাকলেও বর্তমানে পানির অভাবে মাত্র ৮ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ হয়। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর আশঙ্কাজনক হারে নেমে যাচ্ছে, যা উত্তরবঙ্গের কৃষি, প্রকৃতি ও পানীয় জলের সংকটকে তীব্রতর করছে।

১৯৮৩ সালে একটি অস্থায়ী চুক্তিকে ভিত্তি ধরে তিস্তার স্থায়ী পানি বন্টন নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছিল, পরবর্তীতে আরও আলোচনা হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত তার সমাধান হয়নি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ভারত শুধু পানি প্রত্যাহার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বর্ষায় গজলডোবাসহ সব কয়টি নদীর গেট খুলে দেয়, যার ফলে বাংলাদেশ বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। ঘরবাড়ি, ফসল ও গবাদিপশু ধ্বংস হয়। খরায় ফসল নষ্ট হয়, মিঠাপানির মাছ বিলুপ্ত হয়, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যায়।

১৯৮৩ সালের চুক্তি অনুযায়ী, তিস্তার পানির ৩৬% বাংলাদেশ ও ৩৯% ভারত পাবে, বাকি ২৫% নদীর প্রবাহের জন্য রাখা হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো বাংলাদেশ কখনও সে পানি পায়নি। ২০০৭ সালে নতুন প্রস্তাবে ৪০% : ৪০% ভাগাভাগি ও ২০% নদীর জন্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু ভারত তা বাস্তবায়ন করেনি।

এটা ভারত সরকারের যেমন রহস্যময়নীতি, তেমনি পানি ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃসীমান্ত নদীর ন্যায্য পানি বন্টনের জন্য জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার বেশ কিছু কনভেনশন আছে বাংলাদেশ কেন তাতে স্বাক্ষর করেনি সেটা দেশবাসীর কাছে রহস্যময় মনে হচ্ছে। বাংলাদেশ ১৯৯৭ সালের জাতিসংঘ কনভেনশনে স্বাক্ষর করলে আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোর পানি বন্টন ও ব্যবস্থাপনায় আইনসঙ্গত অধিকার পেত। ভারতও কনভেনশনে স্বাক্ষর করেনি এবং এটি বাস্তবায়নে আপত্তি জানিয়েছে। বিগত শাসকদের কেউ কেউ যেমন ভারতের সাথে মধুময়সম্পর্কের বন্দনা গাইতে গিয়ে আবেগের আতিশয্যে অমর্যাদাকর কথাও বলেছে, আবার কেউ কেউ বিদ্বেষপূর্ণ কথা বললেও উভয় সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা ও নিক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছে। যার পরিণতিতে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হয়েছে বাংলাদেশ। এ বিপন্ন দশা থেকে রক্ষা পেতে হলে বিজ্ঞানসন্মত পদক্ষেপ এবং জনগণকে যুক্ত করা জরুরি। নদী আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ বাঁচায়-নদী বাঁচাতে সর্বাত্রিক ও সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

তিস্তা ও নদী রক্ষায় বাসদের দাবি

বাসদ দীর্ঘদিন ধরে তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে সংগ্রাম করে আসছে।

তিস্তা কনভেনশনের সুপারিশ

● পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে তিস্তা চুক্তি সম্পন্ন করে তা কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে।

● আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে ভারতকে উজানে একতরফা বাঁধ নির্মাণ বন্ধ করতে হবে।

● সরকারের তরফ থেকে ১৯৯৭ সালের জাতিসংঘ কনভেনশনে এখনই স্বাক্ষর করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের পানি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক নদী কমিশনের [(ICWC) International Commission on Water Courses] সহযোগিতা নিতে হবে।

● নদী প্রবাহ রক্ষা এবং পানি বন্টনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, নদী গবেষণা ও পানি দূষণ রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

● নদী রক্ষাকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করে নদী দূষণ ও দখল বন্ধ করতে হবে। দখলকৃত নদী উদ্ধার করতে হবে। দূষণকারী ও দখলদারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

● নদী বিশেষজ্ঞ, স্থানীয় জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মতামত অনুযায়ী নদী-পানি, সেচ-বাঁধ ও সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া।

● ‘নদী বাঁচলে দেশ বাঁচবে’—এই ধারণাকে সামনে রেখে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

তিস্তা মরলে উত্তরবঙ্গ মরবে, তিস্তা বাঁচানোর লড়াইয়ে শামিল হোন!

তিস্তাসহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে বাসদ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের উদ্যোগে পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়, নদী সুরক্ষা ও মরু্করণের হাত থেকে উত্তরবঙ্গকে রক্ষার দাবিতে ১০ এপ্রিল সকালে রংপুর শহরের শাপলা চত্বরে সমাবেশ করে লাল পতাকা মিছিল নিয়ে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

রংপুর জেলা বাসদের আহবায়ক কমরেড আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন নওগাঁ জেলা আছ্যায়ক জয়নাল আবেদীন মুকুল, গাইবান্ধা জেলা আছ্যায়ক গোলাম রব্বানী, কুড়িগ্রাম জেলা আছ্যায়ক ফুলবর রহমান, রংপুর জেলা সদস্যসচিব মমিনুল ইসলাম, ছাত্রনেতা রিনা মুরমু, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গত দুই দশক ধরে তিস্তাসহ ৫৪টি নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা, নদী সুরক্ষা, দখল-দূষণের বিরুদ্ধে বাসদ আন্দোলন করে আসছে। অসংখ্য সভা-সমাবেশ, মিছিল, বিক্ষোভ, লংমার্চ, রোডমার্চ, কনভেনশন মতবিনিময় সভা করেছে। সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছি, স্মারকলিপি দিয়ে বিষয়টা সুরাহা করার জন্য প্রস্তাব ও রূপরেখা তুলে ধরেছি।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, বাসদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন দীর্ঘদিন দাবি জানালেও কোন সরকারই এ সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হয়নি, আন্তর্জাতিক ফোরামে নদীর পানির হিস্যার দাবি তোলেনি এবং আন্তর্জাতিক কনভেনশনেও স্বাক্ষর করেনি।

নেতৃবৃন্দ দেশের ভবিষ্যৎ সংকটের বিবেচনা অনুধাবন করে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ভারতের পানি আত্মসন তিস্তা নদীর পানি সংকট



উত্তরবঙ্গের মরুভূমিকরণ ও বাংলাদেশের অস্তিত্বের লড়াই

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। দেশের অর্থনীতি, কৃষি, পরিবেশ-প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও জনজীবন নদীর প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহার, উজানে বাঁধ নির্মাণ ও

আন্তর্জাতিক নীতির লঙ্ঘনের ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল আজ মারাত্মক পানিসংকট ও মরুভূমিকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিস্তাসহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানি প্রবাহে ভারতের পানি প্রত্যাহারের আত্মসান নীতি, বাংলাদেশের অর্থনীতি, নৌপরিবহন, প্রকৃতি-কৃষি ও জনজীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

শ্রীলঙ্কায় বামপন্থি সরকারের নতুন বাজেট কেমন হলো?

২০২২ সালে শ্রীলঙ্কায় সংঘটিত হয়েছিল অভূত গণ অভ্যুত্থান। পূর্বের গোতাবায়া সরকারের দুর্নীতি-লুটপাটের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ জনতা আন্দোলনে নামে। এক পর্যায়ে গোতাবায়া দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। অভ্যুত্থানের দুই বছর পর সাম্প্রতিক নির্বাচনে শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে আসে এক ব্যাপক পরিবর্তন। পার্লামেন্টে মাত্র তিনটি আসন থাকা জনতাভিত্তিক পার্টি বা (জেভিপি)র নেতৃত্বাধীন এনপিপি জোট প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হন। মুখ থুবড়ে পড়ে দীর্ঘদিন ধরে শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে ছড়ি ঘোরাতে থাকা বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো। দায়িত্ব নেন জেভিপি নেতা আনুরা কুমারা দিশানায়েকে। দায়িত্ব নেয়ার পরপরই নানা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন আনে এনপিপি এবং বিগত ৭০ বছরের মধ্যে মূল্যবাহিত সবচেয়ে কমিয়ে আনে। যা সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করে। সম্প্রতি গত ফেব্রুয়ারি মাসে এনপিপি সরকার প্রথমবারের মতো তাদের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছে। এরই মধ্যে এই বাজেট নিয়ে চলছে তুমুল আলোচনা। এই বাজেটের মূল দিকগুলো নিয়ে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার ভ্যানগার্ড পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো।

দেশের সংকটের জন্য দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন, ব্যর্থ অর্থনৈতিক নীতি এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতৃত্বই দায়ী। এই কারণগুলোর ফলে জনগণ

চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছেন, এমনকি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে প্রাণ হারানোর মতো ঘটনাও ঘটেছে। ২০২২ সালের অর্থনৈতিক সংকট সমাজের সবচেয়ে শোষিত ও নিপীড়িত জনগণকে ভয়াবহ দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। জনগণ নতুন প্রত্যাশা নিয়ে একটি নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মজবুত করতে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করতে সফল হয়েছি। বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৬.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। ভবিষ্যতে আমরা এমন একটি শক্তিশালী অর্থনীতি নির্মাণ করবো, যা ২০২৮ সালের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা অর্জন করবে। জনগণের প্রকৃত মজুরি কমে যাওয়ার কারণে ন্যায্য বেতন বৃদ্ধি করা জরুরি হয়ে উঠেছে। একটি মানবিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব তার জনগণকে রক্ষা করা। আমাদের এমন একটি পথ তৈরি করতে হবে, যা সমাজের প্রতিটি সদস্যের জীবনমান উন্নত করতে পারে। আমাদের বাজেটের দর্শন হলো—জনগণের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা। আমরা জানি, পূর্ববর্তী শাসকেরা কীভাবে জনগণের করের টাকা লুটপাট ও অপব্যবহার করেছে। আমরা জনগণের করের টাকা সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে পরিচালনা এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

রানা প্লাজা ধসের একযুগ : নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত হয়েছে কি? কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা কনভেনশন ২০২৫

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

২৪ এপ্রিল '২৫, রানা প্লাজা ধসের একযুগ স্মরণে, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে 'কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা কনভেনশন' অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে আলোচনা করেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, অর্থনীতিবিদ এম. এম. আকাশ, মানবাধিকার কর্মী ও আইনবিদ ব্যারিস্টার সারা হোসেন, স্কপের যুগ্ম

সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী আশিকুল আলম, এনসিসিডাব্লিউই-র চেয়ারম্যান বাদল খান, জিআইজেড সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের সদস্যসচিব সিকান্দার আলী মিনা প্রমুখ। কনভেনশন পরিচালনা করেন শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল। ধারণা পত্র উপস্থাপন করেন ডা. মণীষা চক্রবর্তী।

ধারণাপত্র

২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ট্রাজেডির ১২ বছর পার এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১



ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ খেলা : কার লাভ কার ক্ষতি

যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত এবং নিরপেক্ষ স্থানে আলোচনায় বসতে রাজি দুই দেশ। এর আগে উপমহাদেশের যুদ্ধংদেহী দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তান আবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের আওতনে পড়ে ধ্বংস হয় সম্পদ, নিভে যায় মানুষের জীবন, যাদের সাথে যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই। বাড়িঘর হারিয়ে উন্নাস্ত হয়ে পড়ে কত মানুষ। কিন্তু যুদ্ধের আওতনের আলায়ে পরিষ্কার হয়ে উঠে যুদ্ধবাজদের চেহারা, উদ্ঘাটিত হয় তাদের পরিকল্পনা। যদিও তা জেনে সাধারণ মানুষের কিছু করার থাকে না, তাঁরা যুদ্ধের বলি হয়।

এবারের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধটা খুব পরিকল্পিত বলে সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে না। যুদ্ধ করলো দুই দেশ, যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা দিল আমেরিকার ট্রাম্প আর যুদ্ধে খুশি হলো চীন। যুদ্ধে লাভ হলো ভারতের মোদি এবং পাকিস্তানের শাহবাজের, অস্ত্র ব্যবসায়ীদের আর দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হলো দুইদেশের জনগণ বিশেষ করে কাশ্মীরের জনগণের।

ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে দুই দেশের বাইরে। বাংলাদেশ এই যুদ্ধের কোন অংশীদার না হলেও দেশের এমন কোন অঞ্চল নেই যেখানে গত কয়েকদিন ধরে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হয়নি এবং এখনও হচ্ছে না। শুধু বাংলাদেশে নয় এই যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা চলছে দেশে দেশে। কী হবে যুদ্ধের পরিণতি? কতটুকু বিস্তৃত হবে এই যুদ্ধ, কতদিন চলতে পারে আর ফলাফল কী হতে পারে এসব নিয়ে সামরিক বিশ্লেষণ, রাজনৈতিক ভবিষ্যতবাণীতে প্রচারমাধ্যম সয়লাব। মানুষ পড়ছে, শুনছে, মতামত দিচ্ছে এমনকি ঝগড়াও জড়িয়ে পড়ছে।

যুদ্ধটা একপাক্ষিক হয়নি। হামলা এবং পাল্টা

হামলা চলছে, চলছে বাক্যবাণ নিষ্ক্ষেপ পরস্পরের প্রতি। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে রিপোর্ট পাঠে যাচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে হামলার সংখ্যা, আহত নিহতদের সংখ্যা। একটা কথা আছে যে, যুদ্ধে সবার আগে মৃত্যুবরণ করে সত্য। ফলে কার রিপোর্ট যে সত্য সেটা যাচাই করা মুশকিল। যুদ্ধরত উভয়পক্ষই তাদের সাফল্য প্রচার করতে থাকে এবং অপরপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে বলতে থাকে। তারপরও এই তথ্যের ভিত্তিতেই মানুষ আলোচনা করতে থাকেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দুইদেশের ৬০ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন আহত হয়েছেন এর কয়েকগুন বেশি মানুষ।

ভারত পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর থেকেই যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আর জাত্যাভিমানি বৈরিতা নিয়েই চলছে দেশ দুটি। যুদ্ধের প্রথম এবং প্রধান ক্ষেত্র হলো কাশ্মীর। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরপরই ২১ অক্টোবর শুরু হওয়া যুদ্ধ ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতির হয় আর জন্ম কাশ্মীর ভাগ হয়ে যায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ৭৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ যুদ্ধ বিরতি রেখা বা লাইন অফ কন্ট্রোল কাশ্মীরকে বিভক্ত করে। এই কাশ্মীরকে নিয়ে ১৯৬৫ সালেও ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়। এর পর পূর্ব পাকিস্তানে শত্রু সম্পত্তি আইন জারি করে হিন্দু সম্পত্তি দখল ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটানো হয়। ২০১৯ সালেও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়ি বহরে হামলা, এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১